প্রিয়তমেষু

হুমায়ূন আহমেদ

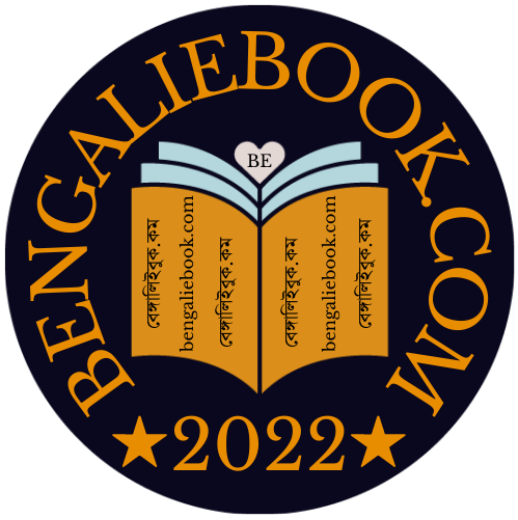

সূচিপত্র

১. কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে.....3

২. রাত আটটা বাজতেই পুষ্পর ঘুম পেয়ে যায় 16

৩. কলিংবেলটা কী সুন্দর করেই না বাজে 25

৪. পুষ্প ঠাণ্ডা মেঝেতে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে.....38

৫. জহিরের দাড়ি শেভ করবার ব্যাপারটা.....51

৬. পুষ্পদের বাড়িওয়ালা আওলাদ সাহেব 64

৭. নিশাত বলল, ছটফট করছ কেন 74

৮. মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ 86

৯. রকিব জেগে আছে.....103

১০. নিশাত খুব ভোরবেলায় তার মার বাড়িতে 108

১১. রকিব তিন দিন অফিসে এসেছে.....114

১২. কোনো কারণে জহির রেগে আছে.....126

১৩. বিখ্যাত লোকদেরই কি চেহারা খারাপ.....134

১৪. পুষ্প হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে.....140

১৫. দুপুরের খাবারের বিশাল এক আয়োজন.....148

১৬. টেলিফোন.....153

১৭. দুটি গোলাপগাছ মরে গেছে.....158

১৮. আসামীর ক্রস একজামিনেশন.....167

১৯. নিশাত খুব কাঁদছে.....170

১. কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

নিশাত কী-হোলে চোখ রাখল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ দরজায় ধাক্কা পড়ছে। নিশাত বলল, কে? কোনো উত্তর নেই। চাপা হাসির মত শব্দ। নিশাত দরজা খুলল। আশ্চর্য কাণ্ড। এইটুকু একটা বাচ্চা। সবে দাঁড়াতে শিখেছে। তাও নিজে নিজে নয়। কিছু একটা ধরে দাঁড়াতে হয়। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে কেমন দুলছে।

খোকন, তোমার কি নাম?

খোন বিশাল একটা হাসি দিল। নিচের মাটীর একটিমাত্র দাঁত। সেই দাঁত হাসির আভায় ঝিকঝিক করছে। নিশাত উচু গলায় জহিরকে ডাকল, এই, কাণ্ড দেখে যাও।

কি কাণ্ড?

না দেখলে বুঝবে না। বিরাট এক অতিথি এসেছে।

জহির গলায় টাই বাধছিল। আয়নার সামনে থেকে নড়া উচিত নয়, তবু নড়ল। নিস্প্রণ গলায় বলল, এ কে?

পাশের বাসার। কী রকম অসাবধান মা দেখেছ? বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়েছে। যদি সিঁড়ির দিকে যেত।

জহির আয়নার সামনে চলে গেল। টাইয়ের নটে গোলমাল হয়ে গেছে। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। সে নট ঠিক করতে করতে বলল, নিশাত, বাচ্চাটাকে ঘরে ঢুকি না।

ঢেকাব না কেন?

বাচ্চাদের একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে, সাজানোগোছাননা ঘর দেখলেই এরা প্রাকৃতিক কর্মটি করে ফেলে। ও এক্ষুণি তা করে ফেলবে।

ফেলুক। এই খোকন, ভেতরে আসবে? টুটু টুটু।

নতুন কেনা কার্পেট, খেয়াল রেখো।

নিশাত বলল, মা-টা কেমন দেখলে? একদম নেংটোবাবা করে রেখে দিয়েছে। একটা প্যান্ট পরাবে না?

আয়নায় নিশাতের ছায়া পড়েছে। জহির অবাক হয়ে দেখল, নিশাত বাচ্চাটার পেটে নাক ঘষছে। জহির হালকা গলায় বলল, আদরটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে না?

আদর কখননা বাড়াবাড়ি হয় না। বাড়াবাড়ি হয় ভালবাসায়।

যার বাচ্চা তাকে দিয়ে এস। দেখ কেমন গা মোচড়াচ্ছে—এটা হচ্ছে বড় কিছু করবার প্রস্তুতি।

আচ্ছা, এর হাতে একটা ক্র্যাকার দেব? গলায় বেঁধে যাবে না তো আবার?

ক্রাকারফ্যাকার দিও না। লোভে পড়ে যাবে। রোজ আসবে।

আহা আসুক না। এই খোকন, ক্র্যাকার খাবে? টুটু টুটু।

খোকন জবাব দেবার আগেই খোকনের মার ভয়-কাতর মুখ দেখা গেল। নিশাত লক্ষ করল বেচারি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে,কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। নিশাত সহজভাবে বলল, এত ছোট বাচ্চাকে একা ছাড়তে আছে? যদি সিড়ির দিকে যেত?

ও ঘুমাচ্ছিল। কখন যে জেগেছে বুঝতেও পারি নি।

বাচ্চার কি নাম? ওর নাম পল্টু।

পল্টু আবার কী রকম নাম? বড় হলে ওর বন্ধুরা ওকে বন্টু বলে খেপাবে। ওর একটা ভালো নাম রাখুন।

মেয়েটি হেসে ফেলল। নিশাত বলল, আসুন না, ভেতরে আসুন। মেয়েটি লাজুক দৃষ্টিতে জহিরের দিকে তাকাচ্ছে। নিশাত বলল, ও এক্ষুণি অফিসে চলে যাবে। আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হোক। আমরা পাশাপাশি থাকি অথচ আলাপ নেই।

ঘর খোলা রেখে এসেছি। তালা দিয়ে আসি?

বলেই মেয়েটি উত্তরের অপেক্ষা করল না। ছুটে চলে গেল।

জহির হ্যান্ডব্যাগে অফিসের ফাইল ভরতে-ভরতে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, ভদ্রমহিলা বেশ অসাবধান। ব্লাউজের বোতাম খোলা ছিল, তুমি লক্ষ করেছ?

এত কিছু থাকতে তোমার চোখ গিয়ে পড়ল ঐখানে! আয়নার ভেতর দিয়ে এত সব দেখে ফেললে?

তোমার কি ধারণা আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি?

নিশাত জবাব দিল না। তার একটু মন-খারাপ হয়েছে। জহির রাউজের এই প্রসঙ্গ না তুললেও পারত। শালীনতার একটা ব্যাপার আছে। জহিরের কি তা মনে থাকে না।

রাগ করলে নাকি নিশাত?

না। এত চট করে রাগ করলে চলে না। আজও কি তোমার ফিরতে দেরি হবে, না সকাল-সকাল ফিরবে?

রাত আটটার মধ্যে ফিরব। পজেটিভ।

পল্টু সাহেব তার কাজটি এখন সারছেন। কার্পেটের উপর তীর বেগে ঝর্নার ধারা পড়ছে। পল্টুর মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। নিশাত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকাল জহিরের দিকে। জহির কিছু বলল না। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল। তার আজকের বিদায় অন্য দিনের মত হল না। অন্য দিন নিশাত তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সিড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দু-একটা টুকটাক

কথা হয়। আশেপাশে কেউ না-থাকলে জহির অতি দ্রুত তার ঠোঁট এগিয়ে আনে। সেই সুযোগ সে খুব বেশি পায় না।

পর মা ফিরে এসেছে। এর মধ্যেই সে বেশভুষার কিছু পরিবর্তন করেছে। প্রথম যে-জিনিসটা নিশাতের চোখে পড়ল, তা হচ্ছে ব্লাউজের বোতাম লাগান। চুল খোঁপা করা। পরনে অন্য একটা শাড়ি।

আপা আসব?

আসুন আসুন।

উনি অফিসে চলে গেছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি তো আজ ওঁকে এগিয়ে দিলেন না? রোজ দেন।

নিশাত একটু যেন হকচকিয়ে গেল। অবশ্যি তার বিস্ময়ের ভাব তেমন প্রকাশ পেল না। এই মেয়েটি যদি অফিসে এগিয়ে দেবার ব্যাপারটা লক্ষ করে তা হলে আরো কিছু হয়তো লক্ষ করেছে। নিশাত সহজ গলায় বলল, আপনি চা খাবেন? চাকরি আপনার জন্যে?

জ্বি আচ্ছা। আর আপা, আমাকে আপনি-আপনি করে বলবেন না। আমার বয়স কিন্তু খুব কম।

তাই নাকি?

জ্বি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাঝখানে আমার বিয়ে হল। অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে বাসায় এসে শুনি আমার বিয়ে। কয়েক জন লোক ডেকে এনে বিয়ে। সেই রাতেই শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম।

বাকি পরীক্ষাগুলো নিশ্চয়ই দাও নি?

জ্বি-না। আমার শ্বশুরসাহেব বললেন, মেয়েদের আসল পরীক্ষা হল সংসার। ঐ পরীক্ষায় পাস করতে পারলে সব পাস।

ঐ পরীক্ষায় কি পাস করেছ?

সে হেসে ফেলল। নিশাত বলল, তুমি বস এখানে। বাচ্চার সঙ্গে খেলা কর, আমি চা বানিয়ে আনছি। খোকনের হাতে কি আমি একটা ক্র্যাকার দেব?

দিন না। যা দেবেন ও তাই খাবে। গলায় আটকাবে না তো আবার?

উঁহু। আটকাবে কেন? এক দিন ও তার বাবার একটা সিগারেট গিলে ফেলেছিল। প্যাকেট থেকে বের করে টপ করে মুখে দিয়ে ফেলল। তারপর সে কী বমি।

নিশাত চায়ের পানি চড়িয়েছে। সকালের কিছু কাজকর্ম তার এখনো বাকি। নাশতার প্লেট পরিষ্কার করা হয় নি। লরি ছেলেটা আসবে কাপড় নিতে। টেলিফোন অফিসে যেতে হবে। সাত শ টাকা বিল এসেছে। অথচ টেলিফোন বলতে গেলে করাই হয় নি। কমপ্লেইন

করতে হবে। কলাবাগানে মার কাছে যাওয়া দরকার। গত সপ্তাহে যাওয়া হয় নি। মা নিশ্চয়ই রেগে আছেন।

আপা আসব?

রান্নাঘরের দরজা ধরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

এস।

বাবু ঘুমাচ্ছে।

বিছানায় শুইয়ে দাও।

বিছানা লাগবে না, ও আরাম করে কার্পেটে ঘুমাচ্ছে। আপা, আপনার রান্নাঘরটা কী সুন্দর।

তোমার পছন্দ হচ্ছে?

খুব পছন্দ হচ্ছে। খুব সুন্দর। ছবির মতন।

তোমার রান্নাঘরও তুমি এরকম করে সাজিয়ে নাও। রানাঘর তো একই রকম।

আপনি কি ভেবেছেন আমরা পাশের ফ্ল্যাটটায় ভাড়া থাকি? মোটেই না। ও বেতনই পায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। তাও বাড়ি ভাড়া মেডিকেল সব মিলিয়ে। এর মধ্যে দু শ টাকা কেটে নেয়। আর ফ্ল্যাটের ভাড়াই পাঁচ হাজার। ওর এক দূর সম্পর্কের চাচা ফ্ল্যাটটা ভাড়া

নিয়েছিলেন। তিন মাসের অ্যাডভান্স দিলেন। উঠলেন। না। ইরান না ইরাক কোথায় নাকি যাচ্ছেন। বাড়িওয়ালা অ্যাডভান্সের টাকাও ফেরত দেবে না। চাচা বললেন, ঠিক আছে, তোরা থাক এই ক দিন।

ভালই তো হল, তিন মাস থাকা গেল।

দুই মাস তো আপা চলেই গেল। ওর যা কষ্ট! অফিসের পর রোজ বাসা খুঁজতে যায়। ফিরতে-ফিরতে রাত নটার মতো বাজে। এক দিন ফিরল রাত এগারটায়। বাসাবো না কোথায় নাকি গিয়েছিল।

নাও, চা নাও। চিনি হয়েছে কি না দেখ তো! চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু খাবে? টোস্টে জেলি মাখিয়ে দিই?

দিন।

নিশাত টোস্টের টিন বের করল। ফ্রীজ খুলে জেলির কৌটা বের করল। একটা পিরিচে পটেটো চিপস ঢালল।

আপা, আমি যে হুট করে রান্নাঘরে চলে এসেছি, আপনি কি রাগ করেছেন?

রাগ করব কেন? তুমি আসায় বেশ সুন্দর গল্প করতে পারছি। যখন ইচ্ছা হয় আসবে। আমি একাই থাকি।

আপা, আমার নাম পুষ্প।

বাহ্, খুব সুন্দরপুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে। কে লিখেছে জান?

জ্বি-না।

বইটই তেমন পড় না বোধহয়?

আগে পড়তাম, এখন সময়ই পাই না। কোনো কাজের লোক নেই। সবকিছু নিজের করতে হয়।

কাজের লোক আমারও নেই। অবশ্যি আমরা দুজনমাত্র মানুষ—আমাদের দরকারও হয় না।

একটা বাচ্চা হোক, তখন দেখবেন কত কাজ! নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবেন না। আপা, আমি এখন যাই?

আচ্ছা, আবার এসো। পট্ সাহেবকে এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে নেবার দরকার নেই। কাঁদবে হয়ত। জেগে উঠলে আমিই দিয়ে আসব।

পুষ্প চলে গেল। পল্টু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। এক হাতে একটা ক্রাকার। তা এখনো হাতে ধরা আছে। নিশাত খুব সাবধানে পল্টুকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। এ তার মায়ের রূপ পেয়েছে।

নিশাতের মনে হল সে ছোট্ট একটা ভুল করেছে। পুষ্পকে বলা দরকার ছিল, পুষ্প, তুমি খুবই সুন্দরী একটি মেয়ে। মেয়েটা খুশি হত। মেয়েটিকে দেখেই মনে হয় এ অল্পতে খুশি হওয়া মেয়ে। এই ধরনের মেয়েরাই প্রকৃত সুখী হয়।

স্বামী হয়তো শোবার আগে মিষ্টি করে একটা কথা বলবে, এতেই আনন্দে এমেয়ের চোখ ভিজে উঠবে। সমস্ত দিনের গ্লানি ও বঞ্চনার কথা মনে থাকবে না। শুধু মনে হবে তার চেয়ে সুখী এ-পৃথিবীতে কেউ নেই।

বাচ্চা ছেলেটা ঘুমের মধ্যেই হাসছে। কী অপূর্ব দৃশ্য। ঠোঁটের কোণে বিসকিটের গুঁড়ো লেগে আছে। যেন কেউ চন্দন মাখিয়ে দিয়েছে। আর হাসছে কী মিষ্টি করে। অপূর্ব কোনো স্বপ্ন দেখছে হয়তো। শিশুদের স্বপ্ন কেমন হয় কে জানে।

এই সুন্দর হাসির একটা স্কেচ করে রাখলে কেমন হয়? পেনসিল আছে না ফুরিয়ে গেছে নিশাত মনে করতে পারছে না। আজকাল ছবি আঁকাই হয় না। কোন জিনিসটি আছে কোনটি নেই কে জানে! বেশ কিছু চারকোল ব্লক এক বার ব্যাংকক থেকে নিয়ে এসেছিল। ইচ্ছা ছিল প্রচুর চারকোল ড্রইং করবে। একটিও করা হয় নি। ছবি আঁকার ইচ্ছা হয়েছে, আঁকা হয় নি। কোনো ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এটাও হবে না। কাগজ এবং পেনসিল নিয়ে বসবার পর হয়তো আর আঁকতে ইচ্ছা করবে না। অদ্ভুত একধরনের আলস্য বোধ হবে। বাচ্চা ছেলেটি এখনো ঠোঁট বাঁকিয়ে আছে। কী বিশ্রী একটা নাম! এই যুগের ছেলেদের কত সুন্দর-সুন্দর নাম রাখা হচ্ছে—অয়ন, মৌলী, নাবিল, তা না—পল্টু। ছিঃ! পুষ্পকে বলতে হবে নামটা বদলে দিতে। দরকার হলে সে নিজে সুন্দর একটা নাম খুঁজে

দেবে। টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। বাচ্চাটার আবার ঘুম না ভেঙে যায়। নিশাত ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল। কলাবাগান থেকে মা টেলিফোন করেছেন।

নিশাত কথা বলছিস?

হ্যাঁ মা।

তুই আজ সন্ধ্যায় আসতে পারবি?

আমি তো ভাবছিলাম এখুনি আসব।

চলে আয়। গাড়ি পাঠাতে পারব না, তোর বাবা নিয়ে গেছেন।

গাড়ি লাগবে না মা।

তোর গলাটা এমন ভারি-ভারি শোনাচ্ছে কেন?

জানি না মা।

তোর কি কোনো ব্যাপারে মন খারাপ?

হুঁ।

কি হয়েছে? জহিরের সঙ্গে ঝগড়া?

না, ওর সঙ্গে আমার কখনন ঝগড়া হয় না। তোমাকে বলেছিলাম না, বিয়ের সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কখন ঝগড়া করব না? স্ট্যাম্পের উপর সই করে প্রতিজ্ঞা।

তা হলে মন খারাপ কেন?

তা তো মা জানি না। মাঝে-মাঝে আমার এরকম হয়। সন্ধ্যাবেলা আসতে বছ। কেন? কি ব্যাপার?

তোর বাবার কাণ্ড! বিরাট এক পাঙ্গাশ মাছ কিনে এনেছে। খুব নাকি ফ্রেশ মাছ। সবাইকে নিয়ে খাবে।

বাবা এমন খাই-খাই করে কেন বল তো মা?

জানি না। একেক বার এমন বিরক্ত লাগে। কিছুক্ষণ আগে ঐ মাছের ছবি তোলা হল।

মা শোন, কয়েকটা সুন্দর দেখে ছেলের নাম দিও তো!

কেন রে?

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের দেবশিশুর মত একটা ছেলের নাম রেখেছে পল্টু। নামটা পাল্টাব।

তুই এখনো পাগলী হয়েই রইলি।

নিশাতের মা খুব হাসতে লাগলেন। নিশাতও হাসছে। বাচ্চাটির ঘুম ভেঙে গেছে। প্রথমে সে কাঁদবার উপক্রম করেছিল, এখন মত পাল্টে হাসিতে যোগ দিয়েছে। খুব হাসছে।

২. রাত আটটা বাজতেই পুষ্পর ঘুম পেয়ে যায়

রাত আটটা বাজতেই পুষ্পর ঘুম পেয়ে যায়। নটার দিকে সেই ঘুম এমন হয় যে, সে চোখ মেলে রাখতে পারে না। ঘুম কাটানোর কত চেষ্টা সে করে। কোনোটাই তার বেলায় কাজ করে না। অথচ রকিব রোজ ফিরতে দেরি করে। আজও করছে।

এখন বাজছে নটা তেত্রিশ। আজ বোধহয় দশটাই বাজাবে। পুষ্প চোখে পানি দিয়ে। এল। জিভে লবণ ছোঁয়াল। জিভে লবণ ছোঁয়ালে নাকি ঘুম কাটে। তার কাটছে না। আরো যেন বাড়ছে।

রকিব ফিরল দশটায়। বিরক্ত মুখে বলল, কী যে তোমার ঘুম, আধঘন্টা ধরে বেল টিপছি। তাড়াতাড়ি গোসলের পানি দাও। পুষ্প ঘুম-ঘুম চোখে রান্নাঘরে ছুটে গেল। প্রচণ্ড গরমেও রকিবের গোসলের পানিতে এক কেতলি ফুটন্ত পানি ঢালতে হয়। একটু ঠাণ্ডা পানি গায়ে লেগেছে কি লাগে নি, লোকটির ঠাণ্ডা লেগে যায়। খুখুক কাশি, গলা ব্যাথা। কী অদ্ভুত মানুষ।

রকিব বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করল না। রকিবের স্বভাব হচ্ছে গোলস করতে-করতে খানিকক্ষণ কথা বলা। বাথরুমের দরজা খোলা এই কারণেই। পুষ্পের এটা ভালো লাগে না। বলেছেও কয়েক বার।

রকিব কান দেয় নি।

পুষ্প, বাড়ি একটা পাওয়া গেছে।

তাই নাকি?

দুটো রুম। নেট দেওয়া বারান্দা। গ্যাস ইলেকট্রিসিটি দুই-ই আছে।

ভাড়া কত?

কম। খুবই কম।

কত?

আন্দাজ কর তো দেখি?

পনের শ?

রকিব মনের আনন্দে খানিকক্ষণ হাসল। যেন সে মজা পাচ্ছে।

বল না কত?

বার। ওনলি টুয়েলভ হাড্রেড।

সত্যি?

হুঁ। একটা সমস্যা আছে। সাময়িক সমস্যা। ফর দা টাইম বীইং একটু অসুবিধা হবে। ধর তিন-চার মা। তার পরই সমস্যার সমাধান।

সমস্যাটা কী?

পানির কানেকশন দেয় নি। মাস তিনেক লাগবে। ওয়াসার ব্যাপার।

পুষ্প অবাক হয়ে বলল, পানি ছাড়া চলবে কীভাবে?

সব ঠিক করে রেখেছি। একটা ড্রাম কিনে ফেলব। লোক রাখব। ঠিকা লোক। তার কাজই হবে সকালবেলা ড্রাম ভর্তি করে দেওয়া। এক ড্রামের বেশি পানি তো আমাদের লাগবে না।

পুষ্প ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। এক বার ভাবল বলবেপানি-ছাড়া বাড়িতে যাব না। বলল না, কারণ বললেই চেঁচামেচি শুরু করবে। রাতে হয়তো ভাতও খাবে না। ধীরেসুস্থে বললেই হবে। পুষ্প খাবার বাড়তে শুরু করল। খাবারের আয়োজন খুবই খারাপ। ডাল চচ্চড়ি আর ভর্তা।

পুষ্প বলল, আস্তে আস্তে খাও। আমি চট করে একটা ডিম ভেজে আনি।

ডিম লাগবে না। এতেই হবে।

না, হবে না।

তা হলে ঐ সঙ্গে দুটো শুকনো মরিচ ভেজে আনবে।

রকিবের চোখ উজ্জ্বল। বাড়ির সমস্যা মিটে গেছে, এই আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। সে ভাত মাখতে-মাখতে বলল; পানির এত দরকারও আমাদের নেই। মরুভূমিতে লোকজন কী করে? এক গ্রাস পানি হলে তাদের তিন দিন চলে যায়।

আমরা তো আর মরুভূমিতে থাকি না।

তা না থাকলাম। তাই বলে অপচয় করব?

পুষ্প এক সময় বলল, তোমার বন্ধু মিজান সাহেবকে বল না, উনি যে এক বার বলেছিলেন বাড়ি দেখে দেবেন।

ওর কথা বাদ দাও। এক শ ধান্ধায় থাকে। ঝোঁকের মাথায় বলেছিল, এখন হয়তো মনেও নেই।

তবু এক বার বলে দেখা

আচ্ছা বলব। বাসায় চা খেতে এক দিন ডাকব। তখন মনে করিয়ে দিলেই হবে। লাভ হবে না। ঢাকা শহরে দুই হাজারের নিচে বাড়ি নেই। এটা হয়ে গেছে বড়লোকের শহর।

শোবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া রকিবের স্বভাব। মশারির ভেতর থেকে আধখানা শরীর বের করে আয়েশ করে সিগারেট খায়। সিগারেটের শেষ অংশ হাতে থাকতে থাকতেই তার ঘুম এসে যায়। আজ রুটিনের সামান্য ব্যতিক্রম হচ্ছে। রকিব খাতাকলম নিয়ে বসেছে। পুষ্প বলল, চিঠি লিখছ?

উঁহু, একটা হিসাব। জটিল হিসাব।

কিসের হিসাব?

বার শ টাকা যদি বাড়িভাড়া হয়, তা হলে সেভিংস কিছু থাকে কি না। আমার খরচটা ধরি–বাসভাড়া, হাত-খরচ, পান-সিগ্রেট–ধর দুই শ।

দু শ-তে হবে না, তিন শ।

আচ্ছা, ধর তিন শ। চাল আমাদের কতটুকু লাগে? আধ মণ লাগে? আধ মণ তো লাগার কথা না। ধর আধ মণই। আধ মণের দাম কত? সরেসটা ধরবে, না প্লেইন? ইরি কত করে মণ।

সাড়ে চার শ টাকা মণ। আধ মণ হচ্ছে দুই শ পঁচিশ।

ধরলাম দুই শ পঁচিশ।

পুষ্প বলল, এস শুয়ে পড়ি। সকালে হিসাবনিকাশ করবে। ঘুম পাচ্ছে। বাবু দুপুরে ঘুমুতে দেয় নি।

কতক্ষণ আর লাগবে। খুব টাইট বাজেটের ভেতর দিয়ে চললে আমার মনে হয় কিছু সেভ করা যাবে।

পুষ্প মশারির ভেতর ঢুকে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার, শোয়ামাত্র তার ঘুম কেটে গেল। মনে হতে লাগল তার মতো সুখী মেয়ে এই পৃথিবীতে নেই। ছোট্ট সংসার। ভালোমানুষ ধরনের স্বামী। শাশুড়ি-ননদের কোনো ঝামেলা নেই। এর চেয়ে বেশি সুখী একটি মেয়ে কী করে হয় তার জানা নেই।

পুষ্প।

বল।

প্রতি মাসে একটা-দুটা প্রাইজবন্ড কিনে রাখব, বুঝলে। লেগে গেলে কেল্লা ফতে। আমাদের অফিসের এক জন দশ হাজার টাকা পেয়ে গেল। হাজার পাঁচেক টাকা সবসময় হাতে থাকা দরকার। কখন কি ঝামেলা হয় কিছুই বলা যায় না।

পুষ্প চুপ করে রইল। এক বার ভাবছিল বলবে, আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে। আমার নানি দিয়েছেন। বলল না। নানিজান হজ্বে যাবার সময় তাদের তিন বোনের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির পুরোটাই বিলি-ব্যবস্থা করে গেলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল হজ্ব করে তিনি ফিরবেন না। ইশতেখারা করে নাকি এই খবর জেনেছেন। হজ্ব করে তিনি পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এখন একেক ছেলের সংসারে কিছু দিন করে থাকেন আর তাঁদের বিরক্ত করে মারেন। কারো সঙ্গেই তাঁর বনে না। পুষ্পের খুব ইচ্ছা নানিজানকে এ-বাড়িতে এনে কিছু দিন রাখে। সাহসে কুলায় না। কে জানে এসেই যদি নাতজামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেন। তা হলে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে।

রকিব মশারির ভেতর এসে ঢুকল। পুষ্প বলল, বাতি নেভালে না? বাতি নিভিয়ে আস।

একটু পরে নেব।

পুষ্পের লজ্জা করতে লাগল। রকিবের বাতি না-নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢোকার অন্য অর্থ আছে। পুষ্প খুব সাবধানে তার ছেলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিল। সে যদি জেগে ওঠে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। পুষ্প ক্ষীণ স্বরে বলল আমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে আসি?

উঁহু। অন্ধকারে আমার ভালো লাগে না।

বাবু উঠে যাবে।

উঠবে না।

রকিব পুষ্পকে কাছে টেনে নিল। তার মুখে সিগারেটের কড়া গন্ধ। অন্য সময় এই গন্ধে পুষ্পের বমি আসে। এখন আসছে না। বরং ভালো লাগছে। রকিব কানের কাছে মুখ নিয়ে গাঢ় আদরের কথা বলছে। এই সময়ের আদরের কথার আসলে তেমন গুরুত্ব নেই, তবু পুষ্পের শুনতে ভালো লাগে। তারও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে বলতে পারে না। লজ্জা লাগে। তবে অর্থহীন কিছু কথাবার্তা এই সময়ে সে বলে। রকিব মন দিয়ে শোনে কি না সে জানে না, তবে প্রতিটি কথারই উত্তর দেয়।

পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা হল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, অনেক কথা বললেন। চা খাওয়ালেন। বাবুকে খুব আদর করলেন। বিসকিট দিলেন।

ভালোই তো।

ওঁকে দেখতে অহঙ্কারী মনে হয়, কিন্তু আসলে অহঙ্কারী না। বাবুর পল্টু নামটা ওঁর পছন্দ হয় নি।

তাঁদের ছেলেপুলেদের নাম কি?

ছেলেমেয়ে নাই। যখন হবে খুব সুন্দর নাম নিশ্চয়ই রাখবেন।

রাখুক যা ইচ্ছা। আমাদের পর্দুই ভালো। মেয়ে হলে মেয়ের নাম রাখব খুন্তি।

কী নাম রাখবে?

খুন্তি।

কী যে তুমি বল! এই দেখ না বাবু মনে হয় উঠে যাচ্ছে। কেমন পা নাড়াচ্ছে দেখ না।

ও ঘুমাচ্ছে মড়ার মতো। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে উঠবে না।

না না, বুঝতে পারছ না, ওর ঘুম ভাঙার সময় হয়ে গেছে।

উঁহু, হয় নি।

বাতিটা নেভাও, তোমার পায়ে পড়ি।

নেভাব না।

বাবু ঠিক এই সময় জেগে উঠল। বিকট স্বরে কেঁদে উঠল। পুষ্প থমথমে গলায় বলল, এখন শিক্ষা হল তো!

রকিব হাসছে। মনে হচ্ছে তার শিক্ষা এখনো হয় নি।

৩. কলিংবেলটা কী সুন্দর করেই না বাজে

এ-বাড়ির কলিংবেলটা কী সুন্দর করেই না বাজে। যেন একটা পুরনো দেয়াল-ঘড়ি ঢং-ঢং করে বাজছে। প্রথম দু-তিন বার খুব গম্ভীর আওয়াজ, তারপর রিনরিনে আওয়াজ। কলিংবেল বাজলেই এই কারণে পুষ্প অনেকক্ষণ দরজা খোলে না। বাজুক যতক্ষণ ইচ্ছা। কী সুন্দর লাগে শুনতে।

পরপর তিন বার বাজার পর পুষ্প উঠল। অসময়ে কে হতে পারে? দুপুর আড়াইটায় কে আসবে? রকিব নাকি? মাঝে-মাঝে অফিস ফাঁকি দিয়ে সে চলে আসে। বিয়ের পরপর এটা সে বেশি করত, এখন অনেক কমেছে। ছোট ভাইয়া না তো? কল্যাণপুরে ছোট ভাইয়ার বাসা। বির সঙ্গে প্রচণ্ড রকম ঝগড়া হলে সে এরকম সময়-অসময়ে চলে আসে। এক বার রাত বারটার সময় সে পুষ্পের শ্বশুরবাড়ি এসে উপস্থিত। ভাবির সঙ্গে ঝগড়া করে বাসে করে চলে এসেছে। হাতে কোনো টাকাপয়সাও ছিল না।

কে?

ভাবি আমি। অধমের নাম মিজান। অনেকক্ষণ ধরে বেল টিপছি। যদি মর্জি হয় দরজা খুলুন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে দরজা খুলল। তার কাপড় অগোছালো। চুল বাঁধা নেই। এতক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝেতে বালিশ এনে শুয়ে ছিল, সেই বালিশ এখনো গড়াচ্ছে।

ঘুম থেকে তুললাম নাকি ভাবি? মেঝেতে শয্যা পেতেছিলেন মনে হচ্ছে।

আসুন, ভেতরে আসুন। ও তো নেই।

সে তো ভাবি জেনেই এসেছি, যাতে খালি বাসায় আপনার সঙ্গে কিছু রঙ্গতামাশা করতে পারি। নাকি আপনার আপত্তি আছে?

পুষ্প কী বলবে ভেবে পেল না। কী অদ্ভুত কথাবার্তা!

ভাবি মনে হচ্ছে আমার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছেন? দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়ে গেছেন। হা হা হ্যাঁ। খুব ঠাণ্ডা দেখে এক গ্লাস পানি দিন তো! বরফ-শীতল পানি।

ঘরে ফ্রীজ নেই। পানি খুব ঠাণ্ডা হবে না।

তা হলে চা বানিয়ে দিন। আগুন-গরম চা। চিনি দেবেন না।

একটুও দেব না? চিনি খান না?

যথেষ্টই খাই। তবে আপনার হাতে খাব না। আপনার বানানো চা এমনিতেই মিষ্টি হবে। হা হা হ্যাঁ।

আপনি বসুন, আমি চা বানিয়ে আনছি।

আপনার পুত্র কোথায়?

পাশের ফ্ল্যাটের আপা নিয়ে গেছেন। ওঁর মার বাসায় গেছেন। সন্ধ্যাবেলা আসবেন।

তা হলে শুধু আপনি আর আমি, এই দুজনই আছি? বা ভালোই তো!

পুষ্পের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কী অদ্ভুত কথাবার্তা! সে দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকল। তার কেবলই মনে হতে লাগল রকিবের এই বন্ধু রান্নাঘরে উকি দেবে। তা অবশ্যি দিল না। চা বানিয়ে এনে পুষ্প দেখে ফুল স্পীড ফ্যান ছেড়ে তার নিচে মিজান দাঁড়িয়ে।

কি জন্যে এসেছি সেটা আগে বলে ফেলি, নয়ত কি না কি ভাববেন কে জানে। রকিব বাড়ির কথা বলছিল। সোবহানবাগে দুটা বাসা আছে। একটা হাফ বিল্ডিং, উপরে টিন। দুই কামরা, গ্যাস, পানি, ইলেকট্রিসিটিসবই আছে। ভাড়া তের শ। আরেকটা আছে তিন তলার ফ্ল্যাট। ভাড়া সতের শ। মালিকের সঙ্গে আমার চেনাজানা আছে। কিছু কমাবে। অ্যাডভান্স লাগবে না। রকিবকে নিয়ে দেখে এসে মনস্থির করুন। বাহ্, ফাসক্লাস চা হয়েছে।

আপনি দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন কেন, বসুন।

ভাবি মনে হচ্ছে একটু স্বস্তি পেলেন। এখন ভাবছেন লোকটা রঙ্গ-তামাশা করতে আসে নি। ঠিক করে বলুন তো, তাই ভাবছিলেন না?

পুষ্প ফ্যাকাসেভাবে বলল, জ্বি-না।

না বললেও বিশ্বাস করব না। চোখমুখ কেমন সাদা হয়ে গেছে। ভাবি চলি।

এখুনি যাবেন?

যদি যেতে নিষেধ করেন যাব না। সুন্দরী মহিলার নিষেধ অগ্রাহ্য করব এত বড় বোকা আমি না। তবে আজ না ভাবি। ড্রাইভারকে আজ সকাল-সকাল ছেড়ে দিতে হবে। চলি, কেমন? ও আচ্ছা, বাড়ির ঠিকানা তো দেওয়া হয় নি। কাগজ-কলম আনুন।

মিজান ঠিকানা লিখে সত্যি-সত্যি চলে গেল। যাবার আগে বলল, বেয়াদপি হলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন ভাবি। আর রকিবকে আমি খবর দিয়ে দেব যাতে সকালসকাল অফিস থেকে ফেরে। আজই দেখে আসবেন। দেরি করবেন না। বাড়ির খুব ক্রাইসিস।

রকিব পাঁচটার আগেই ফিরল। চা খেয়েই বাড়ি দেখতে বেরুল। সঙ্গে পুষ্প। বাবুকে নিয়ে নিশাত এখনন ফেরে নি। রকিব বিরক্ত মুখে বলল, কার-না-কার কাছে বাচ্চা দিয়ে দাও!

আগ্রহ করে নিতে চাইলেন।

আগ্রহ করে কেউ বাচ্চা নিতে চাইলেই বাচ্চা দিয়ে দেবে? চেন না, জান না!

চিনব না কেন? বাবু খুব খুশি হয়ে গেছে। গাড়িতে চড়তে খুব পছন্দ করে। গাড়ি নিয়ে তো কোথাও যাওয়া হয় না।

গাড়ি নিয়ে যাওয়া একটা বড় কথা নাকি? মিজানকে বললেই গোটা দিনের জন্য গাড়ি দিয়ে দেবে। খুবই মাই ডিয়ার লোক। বন্ধুদের জন্য খুব ফিলিং। দেখ না নিজে কেমন বাড়ি খুঁজে বের করল। হার্ট অব দা টাউনে।

কেমন বাড়ি কে জানে।

বাড়ি ভালোই হবে। ওর রুচি ভালো। এলেবেলে জিনিস দেখবে না।

দুটি বাড়ির মধ্যে টিনের বাড়িটা পুষ্পের খুব মনে ধরল। কী ছিমছাম। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে অল্প খানিকটা জায়গা। এর মধ্যে দুটা কামিনী গাছ, একটা পেঁপে গাছ এবং একটা কাঁঠাল গাছ। বড়-বড় কাঁঠাল ধরে আছে। রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা স্টোররুম আছে। বাড়ির মেঝে কালো সিমেন্টের। তাকালেই কেমন ঠাণ্ডাঠাণ্ডা ভাব আসে। রকিব বলল, মন্দ নয়, কী বল? নেওয়া যায় না?

খুব নেওয়া যায়। সুন্দর বাড়ি। খুব সুন্দর।

গরমে কষ্ট পাবে। টিনের ছাদ।

টিনের ছাদের বাড়ি রাতের বেলা আরাম হয়। ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তা ছাড়া কেমন। সুন্দর বারান্দা। তুমি বিকালে বরান্দায় বসে চা খাবে।

রকিব শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন?

বারান্দায় চা খাওয়ার মধ্যে কী আছে?

নিশাত আপারা বারান্দায় চা খায়। দেখতে কী ভালো লাগে।

বারান্দা তো তোমারও আছে, তুমি বসে খেলেই পার।

মেঝেতে বসে-বসে খাব? আমাদের কি এঁদের মতো চেয়ার-টেবিল আছে?

হবে, সব হবে। ধীরে ধীরে হবে। আগামী জুন মাস নাগাদ একটা প্রমোশনের কথা আছে।

সত্যি?

হুঁ। তেলাতেলির ব্যাপার আছে। ঐটা করতে হবে ভালোমতো।

কর। সবাই যখন করছে।

করব তো বটেই। তৈল কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী এখন ব্যাটারা বুঝবে।

রকিব সিগারেট ধরিয়ে মহা সুখে টানতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে বাড়ি তারও পছন্দ হয়েছে। পুষ্প মনে-মনে বাড়ি সাজাতেও শুরু করেছে। সুন্দর করে পর্দা দেবে। কয়েকটা বেতের চেয়ার কিনবে। বাসনপত্র কিনবে। জমানো টাকার কিছুটা সে খরচ করবে। একটা ফ্যান কিনতে হবে। সিলিং ফ্যানের কী রকম দাম কে জানে। বলতে গেলে এই প্রথম তার নিজের সংসার। বিয়ের পর দু বছর কাটল শ্বশুরের সঙ্গে ময়মনসিংহে। রকিব আসত সপ্তাহে-সপ্তাহে। কী কষ্ট বেচারার। খাওয়ার কষ্ট। একাএকা থাকার কষ্ট। ঢাকায় ফিরে যাবার সময় কী যে মন-খারাপ করত।

পুষ্প।

কি?

বাইরে খাবে?

কোথায়?

কোনো একটা রেস্তোরাঁয়?

কী যে তুমি বল।

চল যাই। মাঝেমধ্যে একটু বাইরে খাওয়া দরকার। রোজ-রোজ ঘরের খাওয়া একঘেয়ে হয়ে যায়। চল, নানরুটি আর কাবাব খাই।

মাত্র তো সন্ধ্যা! এখন নানরুটি আর কাবাব খাবে?

নিউ মার্কেটে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করি, তারপর না-হয় যাব।

আর বাবু? বাবুর কী হবে?

কী আর হবে? যারা নিয়েছে তারা দেখবে। মজা বুঝক। ভবিষ্যতে তা হলে আর নেবে না।

নিউ মার্কেটে তারা বেশ খানিকক্ষণ ঘুরল। ঠাণ্ডা পেপসি খেল। পুষ্পকে খুবই অবাক করে দিয়ে রকিব একটা শাড়ি কিনে ফেলল। নীল ফুলের ছাপ দেওয়া সুতি শাড়ি। এতেই আনন্দে পুষ্পের চোখে পানি এসে যাবার মত হল। পুষ্প বলল, বাবুর জন্যে কিছু কিনবে না? কোন খেলনাটেলনা?

আরে, ও খেলনার কী বোঝে। খেলনার সময় হোক, কিনে দেব।

নিশাত ঘুমন্ত পল্টুকে তার বিছানায় শুইয়েছে। জহির বলল, নিচে একটা অয়েলক্লথ দরকার না? আমার তো মনে হচ্ছে বিছানা ভাসিয়ে দেবে।

নিশাত বলল, অয়েলথ এখন পাব কোথায়?

ওর বাবা-মার আক্কেলটা দেখ না। রাত নটা বাজে, এখনো ট্রেস নেই।

দুজনে মিলে বেড়াচ্ছে। সুযোগ হয় না বোধহয়। তোমাকে কফি করে দেব?

না।

খুব কঠিন স্বরে না বললে। তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

রাগ করব কেন?

এই যে পরের বাচ্চা নিয়ে আদিখ্যেতা করছি।

তা কিছুটা অবশ্যি করছ। তোমার যখন এত শখ–লেট আস হ্যাভ অ্যা বেবি। ওটা তো তেমন কঠিন কিছু না।

নিশাত কিছু বলল না।

জহির বলল, আমি অবশ্যি এখনন আমাদের অরিজিন্যাল প্ল্যানে বিশ্বাসী। প্রথম পাঁচ বছর ঝামেলাহীন জীবন। দু জন শুধু থাকব, ঘুরে বেড়াব। এক জন অন্য জনকে ভালোমতো জানব.....

এখনন আমাকে জানতে পার নি?

না।

কোন জিনিসটা জানবার বাকি আছে?

তোমার মুডের ব্যাপারটা জানি না। অতি দ্রুত তোমার মুড পাল্টায়। কখন কি জন্যে পাল্টায় সেটা ঠিক ধরতে পারি না। কিছুটা রহস্য থেকেই যায়।

কিছু রহস্য থাকাই তো ভালো। জীবন থেকে রহস্য চলে গেলে তো মুশকিল।

জহির বলল, এক কাপ কফি খাওয়া যেতে পারে।

নিশাত রান্নাঘরে ঢুকে পারকুলেটর চালু করল। আর ঠিক তখন কলিংবেল বাজল। পুষ্প এসেছে হয়ত। নিশাত নড়ল না। জহির দরজা খুলে দেবে। ঠিক এই মুহূর্তে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সে এসে তার বাচ্চা নিয়ে চলে যাক। জহির ঠিকই বলেছে, তার মুড খুব দ্রুত পাল্টায়। এত দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

আপা।

এস পুষ্প।

বাবুকে নিতে এলাম। আমরা আবার বাড়ি দেখতে চলে গিয়েছিলাম।

তাই নাকি? জ্বি। বাসা পছন্দ করে এসেছি। হাফ বিল্ডিং, উপরে টিনের ছাদ।

টিনের ছাদও বর্ষাকালে খুব মজা হবে। ঝুমঝম করে টিনের ছাদে বৃষ্টি হবে। কফি খাবে পুষ্প?

খাব। আমরা আজ বাইরে খেয়ে এসেছি। ও বলল, চল বাইরে খাই।

খুব ভালো করেছ।

আবার কি মনে করে যেন আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিল। টাকাপয়সার এ-রকম টানাটানি, এর মধ্যে আবার হঠাৎ শাড়ি। শাড়িটা দেখবেন আপা? নিয়ে আসি?

আন।

পুষ্প কফির কাপ নামিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে গেল। যাবার সময় বাবুকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। জহির পাশেই ছিল। জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত করেছে।

জহির হালকা গলায় বলল, আমাকে কোনো বিরক্ত করে নি। নিশাতকে হয়তো বা করেছে। আমি ঠিক জানি না। জহিরের মনে হল দরে থেকে মেয়েটাকে গেঁয়ো মনে হলেও মেয়েটা গেঁয়ো নয়। তার মধ্যে স্বাভাবিক একটা সহজ ভাব আছে, এবং মেয়েটি রূপবতী। নিশাতও রূপবতী, তবে নিশাতের রূপে কেমন একটা ঠাণ্ডা ভাব আছে। এর মধ্যে সেই শীতল ভাবটা নেই।

নিশাত পুষ্পের জন্য অপেক্ষা করছে। দু চুমুক দিয়ে সে কফির কাপ নামিয়ে রেখে গেছে। কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে। কাপটা কি একটা পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখবে?

ঐ মহিলা তোমাকে ভাবি না ডেকে আপা ডাকে কেন?

জানি না কেন।

মেয়েটিকে কথাবার্তায় খুব গেঁয়ো কিন্তু মনে হয় না।

গেয়ো বলতে তুমি কী মীন করছ?

রাস্টিক। রিফাইনমেন্টের অভাব। আরো ব্যাখ্যা চাও?

নিশাত কিছু বলল না।

দাঁড়াও, আরেকটা ব্যাখ্যা দিই। মনে কর একটা প্লেটে লাল টুকটুকে একটা আপেল। এক জন সেই আপেলের সৌন্দর্য প্রথম দেখবে, অন্য জন আপেলটাকে দেখবে শুধুই খাদ্য হিসেবে।

আপা আসব?

এস, তোমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আমি কফি খাব না আপা, ভালো লাগে না।

পুষ্পের হাতে শাড়ির প্যাকেট। সে অস্বস্তি বোধ করছে। আড়চোখে তাকাচ্ছে। জহিরের দিকে। এই মানুষটির সামনে শাড়ির প্যাকেট খোলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। নিশাত জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি দয়া করে পাশের ঘরে যাবে? আমরা একটা মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে আলাপ করব, তোমার হয়ত ভালো লাগবে না।

জহির পাশের ঘরে চলে গেল। দরজা ভিড়িয়ে দিল। নিশাত নিজেই শাড়ির প্যাকেট খুলছে।

বাহ্, চমৎকার তো! বাংলাদেশে শাড়ির ডিজাইন অনেক উন্নত হয়েছে। সিম্পলের মধ্যে এরা ভালো জিনিস করছে।

আপনার পছন্দ হয়েছে আপা?

খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার! নীল ব্যাকগ্রাউণ্ডে সাদা ফুল থাকলে মনে হয় আরো সুন্দর হত। আকাশে তারা ফুটে আছে, এরকম একটা এফেক্ট পাওয়া যেত। আমি বেশ কটা শাড়ির ডিজাইন জমা দিয়েছিলাম বিসিকে। একবার খোঁজ নিতে হবে ওরা নিল কি না।

আপনি শাড়ির ডিজাইন জমা দিয়েছিলেন? ও মা, কী বলছেন।

কেন জমা দেব না। আমি কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্রী। একদিন তোমাকে আমার আঁকা ছবি দেখাব।

পুষ্প মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। নিশাত সেই মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আরেক বার মনে-মনে বলল, কী সুন্দর মেয়েটি।

৪. পুষ্প ঠাণ্ডা মেঝেতে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে

পুষ্প ঠাণ্ডা মেঝেতে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে। তার চমৎকার লাগছে। দুপুরবেলার এই সময়টার মধ্যে কোনট-একটা রহস্য আছে। সময়টাকে খুব আপন মনে হয়। সারা শরীরে থাকে ঘুম-ঘুম আলস্য। ঘুমাতে ইচ্ছা করে, আবার জেগে থাকতেও ইচ্ছা করে।

বাবু ঘুমাচ্ছে। তার ঘুমবার ভঙ্গিটা খুব বিশ্রী। হাঁ করে ঘুমায়। আজো হাঁ করে আছে। পুষ্প খুব সাবধানে মুখের হাঁ বন্ধ করে দিল। অভ্যাস হয়ে গেলে মুশকিল। বড় হয়েও যদি হাঁ করে ঘুমায়, তা হলে তো সর্বনাশ!

বাবু ঘুমের মধ্যেই হাত দিয়ে মাকে একটা ধাক্কা দিল। পুষ্প গম্ভীর গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে? মার গায়ে হাত তোলা হচ্ছে। খুব খারাপ। আমি কিন্তু রাগ করলাম। তোমার সঙ্গে আর কোনো কথা হবে না। না না না।

ঘুমন্ত ছেলের সঙ্গে পুষ্পমাঝে-মাঝে সময় ধরে একতরফা কথাবার্তা বলে। টেনেটেনে অনেকটা গান গাওয়ার ভঙ্গিতে। শেষের দিকে কথাগুলো বলা হয় মিল দিয়ে। দিয়ে।

খোকন সোনা
কথা বলে না,
শুধু ঘুমায়, মাথা নাড়ায়
আবার হাসে, ভালবাসে।

এই ব্যাপারগুলি ছেলে জেগে থাকা অবস্থায় বা ছেলের বাবার উপস্থিতিতে পুষ্প কখনন করে না। তার খুব লজ্জা লাগে। এই বাবু তার নিজের, অন্য কারোর নয়—এর মধ্যেও যেন খানিক লজ্জা আছে। এই বাবু অন্য কারোর হলে সে বোধহয় আরো বেশি ভালবাসতে পারত।

খুব অল্প সময়ের জন্যে কলিংবেল বাজল। নিশ্চয়ই নিশাত আপা। নিশাত আপা কলিংবেলটা ছুঁয়েই হাত সরিয়ে নেন। ঘরের ভেতর থেকে কে কে বলে চেচিয়ে মরলেও সাড়া দেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরেক বার বেল টেপেন।

পুষ্প দ্বিতীয় বার বেল টেপার জন্যে অপেক্ষা করল না। উঠে দরজা খুলে দিল। নিশাত নয়, মিজান দাঁড়িয়ে। চোখে সানগ্লাস। চুল উচ্চখুষ্ক।

কি, ভেতরে আসতে বলবেন, না বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

ভাই আসুন।

আমি হচ্ছি অসময়ের অতিথি। আজো দেখি মেঝেতে শয্যা পেতেছেন। মেঝেতে ঘুমোতে বুঝি খুব আরাম?

পুষ্প হাসল। মিজান বলল, আমিও এক দিন শুয়ে দেখব। চট করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি আনুন। হিম-শীতল।

খুব ঠাণ্ডা তো হবে না।

ও আচ্ছা-আচ্ছা, মনে থাকে না। তা হলে চা। আপনার পুত্র দেখি আজ এখানেই আছে। কেউ নিয়ে যায় নি?

জ্বি-না।

সুন্দর ছেলে আপনার। মার বিউটি পেয়েছে। বাবার মতো হয় নি—এটা একটা ভালো ব্যাপার। হা হা হ্যাঁ। রাগ করলেন না তো ভাবি?

জ্বি-না। রাগ করব কেন?

বসতেও তো বলছেন না।

বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

দেরি করবেন না, আমার হাতে সময় বেশি নেই।

পুষ্প চা বানিয়ে নিয়ে এল। লোকটির উপর আজ আর প্রথম দিনের মতত রাগ হচ্ছে না। কত ঝামেলা করে সুন্দর একটা বাসা জোগাড় করেছে। আজকালকার যুগে কে আর বন্ধুদের জন্যে কিছু করে। কেউ করে না।

চিনি হয়েছে?

মিজান চুমুক না-দিয়েই বলল, হয়েছে। যতটুকু মিষ্টি হবার কথা তার চেয়েও বেশি হয়েছে। ভাবি আপনি বসুন। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

পুষ্প বসল। মিজান বলল, মাথায় এমন ঘোমটা দিয়ে বসেছেন কেন? আমাকে লজ্জা করছেন নাকি?

জ্বি-না।

গুড, লজ্জা করবেন না। ঘোমটা ফেলে দিন। এই তো চমৎকার, ইন্দ্রাণীর মতো লাগছে। বুঝলেন ভাবি, খুব সুন্দরী যে-সব তরুণীরা আছে, তাদের বিয়ে করা উচিত নয়। মোটেই উচিত নয়।

উচিত নয় কেন?

সৌন্দর্য হচ্ছে সবার জন্য, এক জন পুরুষের জন্য নয়। প্রাচীন মিশরের একটা নিয়ম কী ছিল জানেন? সবচেয়ে সুন্দরী রমণীদের নাচেগানে শিক্ষিত করে তোলা হত। তাদেরকে আলাদা করে রাখা হত সব পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এরা হত জনপদবধূ। Lady of the town.

পুষ্প হ্যাঁ, না কিছুই বলল না। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই মানুষটি এইসব কথা বলছে কেন?

ভাবি।

জ্বি।

শুনলাম বাসা নাকি আপনাদের পছন্দ হয়েছে।

জ্বি, হয়েছে। খুব সুন্দর বাসা।

ধন্যবাদ তো দিলেন না।

ধন্যবাদ।

শুধু ধন্যবাদ! এর বেশি কিছু না? আপনি দেখছি হার্টলেস।

পুষ্প কী বলবে ভেবে পেল না। বাবুর দিকে তাকাল। বাবুর উঠে পড়ার সময় হয়েছে। এক্ষুণি হয়তো উঠবে। সে মনে-মনে বলল, বাবু ওঠ।

ভাবি।

জ্বি।

এবার তা হলে বিদায় দিন।

আবার আসবেন।

নিশ্চয়ই আসব। যাই তা হলে? যে-জন্য এসেছিলাম তা অবশ্যি এখনো বলা হয়। নি। যদি অনুমতি দেন তা হলে বলি।

পুষ্প ক্ষীণ স্বরে বলল, বলুন।

ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?

পুষ্পের ইচ্ছা করছে লোকটাকে কিছু কড়া কথা বলতে। সে যা করছে তাকে ঠিক ঠাট্টা হিসেবে সে নিতে পারছে না। এইভাবে কেউ ঠাট্টা করে না। ঠাট্টা বোঝর মতো বয়স তার হয়েছে।

এই রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন কেন ভাবি? আপনার কি ধারণা আমি আপনাকে ভয়ানক কিছু বলব? অবসিন কিছু?

জ্বি-না, তা কেন বলবেন?

বলতেও তত পারি?

হা হা হ্যাঁ।

হাসির শব্দে পল্টুর ঘুম ভেঙে গেল। অপরিচিত লোকটিকে সে কিছুক্ষণ দেখল। কেঁদে ওঠার উপক্রম করেই মত বদলাল। হাসিমুখে হামাগুড়ি দিয়ে মার কাছে আসতে লাগল।

মিজান উঠে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, চলি ভাবি, আমি যে এসেছিলাম এটা রকিবকে বলবেন না। কি না কি মনে করে বসবে। স্বামীরা আবার খুব ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

মিজান চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই রকিব এসে পড়ল। রকিবের মুখ হাসি-হাসি। এরকম হাসিমুখ তার সচরাচর থাকে না। খুশির কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই হয়েছে।

মিজান এসেছিল নাকি?

হ্যাঁ।

খুব জ্বালিয়ে গেছে না? হা হা হ্যাঁ। ব্যাটা প্ল্যান করে এসেছে। আমার সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা বাজি—তোমাকে কাঁদিয়ে দেবে। কাঁদাতে পেরেছে? কেঁদেছিলে? আমি বললাম, কাঁদাতে পারবেনা রে বাবা। শক্তচিজ। সে বললপারবেই। তারপর বল রেজাল্ট কি? পাস না ফেল?

পুষ্প জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল।

মিজান এই রকমই। কলেজ লাইফ থেকে দেখছি। দারুণ ফুর্তিবাজ ছোকরা। কাপড় পর। কুইক, ভেরি কুইক। সময় নেই।

কোথায় যাবে?

মিজান কিছু বলে নি?

না।

আরে, এই ব্যাটা তোমার কাছে এসেছে কেন? তার গাড়ি রেখে যাওয়ার জন্যে। গাড়ি রেখে গেছে। বারান্দায় গিয়ে দেখ, ক্রীম কালারের গাড়ি উইথ ড্রাইভার।

গাড়ি দিয়ে কী হবে?

ঘরব। চিড়িয়াখানাফিডিয়াখানা যাব। পন্ট নাকি গাড়ি পছন্দ করে। যাও যাও, দেরি করবে না। দু-এক জন আত্মীয়স্বজনের বাসায়ও যাওয়া যায়, কি বল। গাড়ি যখন পাওয়া গেছে বড়লোক কায়দা করা যাক। রাত নটা পর্যন্ত গাড়ি রাখা যাবে।

বড়লোক কায়দা তারা ভালই করল। চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, বলধা গার্ডেন সব এক দিনে। পল্টু মহা খুশি জে জে জে জে করে নিজের মনে গান গেয়ে যাচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে মাথা বের করবার চেষ্টা করছে। হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। রকিবও খুশি। সে পাঁচটা বেনসন সিগারেট কিনেছে। গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে সিগারেট খাবার মজাই নাকি আলাদা। এর মধ্যে চারটা সিগারেট শেষ। মাঝেমাঝে ড্রাইভারের সঙ্গে কথাও বলছে।

তেল আছে তো ড্রাইভার?

জ্বি স্যার, আছে।

তেল শেষ হয়ে গেলে বলবেন, তেল কিব। নো প্রবলেম। দেশ কোথায় আপনার?

বিক্রমপুর।

খুব ভালো জায়গা। বিক্রমপুরে অনেক গেটম্যানের জন্ম হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বসু, নাম শুনেছেন?

জি না।

সাইনটিস্ট। বিরাট সাইনটিস্ট।

পুষ্পেরও খুব ভালো লাগছে। হাওয়ায় তার চুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই নিয়ে সে খানিকটা বিব্রত। তা ছাড়া বাবুকে সামলাতে হচ্ছে। অতিরিক্ত উৎসাহে সে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে কি না সেটাও দেখতে হচ্ছে। পুষ্প বলল, সাভার স্মৃতি সৌধে যাবে? দেখি নি কখনো।

চল যাওয়া যাক। অসুবিধা কী? অন্য কোথাও যদি যেতে চাও যেতে পার। নটা পর্যন্ত গাড়ি থাকবে। বলা আছে।

ওঁর অসুবিধা হবে না?

হলে হবে। ড্রাইভার সাহেব, একটু গাড়িটা থামান তো। আরো কয়েকটা সিগারেট কিনব। আপনার গাড়িতে ক্যাসেট আছে না?

জি স্যার।

আরে, তা হলে এতক্ষণ চুপচাপ কেন? গান লাগিয়ে দিন। কি বল পুষ্প, গানবাজনা শুনতে শুনতে যাই? ফাইন হবে।

পুষ্প হাসল। ছেলে এবং স্বামী—এই দুজনের মধ্যে এই মুহূর্তে কে বেশি খুশি সে ধরতে পারছে না। দুজনেরই চোখ ঝলমল করছে। ড্রাইভার ক্যাসেট চালু করেছে। গানের

আওয়াজ কী পরিষ্কার। পুষ্পের চোখ ভিজে উঠছে। কে জানে এক দিন এরকম একটা গাড়ি তারা কিনতে পারবে কি না। নিজেদের গাড়িতে গা এলিয়ে বসে গান শুনতে-শুনতে দূর-দূর জায়গায় বেড়াতে যাবে। চিটাগাং, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি। তাদের সঙ্গে ক্যামেরা থাকবে। কোনট-একটা জায়গা পছন্দ হলেই গাড়ি থামিয়ে তারা ছবি তুলবে। ফ্লাস্কে চা থাকবে। মাঝেমাঝে চা খাওয়া হবে। বাবু ঘুমিয়ে পড়বে। সে বলবে একটু আস্তে চালান ড্রাইভার সাহেব, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। এক দিন এরকম তো হতেই পারে। মানুষের কিছু-কিছু কল্পনা তো পূর্ণ হয়। বিয়ের আগে পুষ্প কল্পনা করত নম্র, ভদ্র, লাজুক একটা ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। ছেলেটি রাত জেগে গল্প করছে তার সঙ্গে। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, কিন্তু ছেলেটি তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না। একের পর এক গল্প বলেই যাচ্ছে।

পুষ্পের এই কল্পনাটা খুব মিলে গিয়েছিল। বিয়ের পর তিন মাস রকিব অনবরত কথা বলেছে। পুষ্প ধারণাই করতে পারে নি একজন পুরুষ মানুষের পেটে এত কথা থাকতে পারে। সবই তার নিজের গল্প। খুব ছোটবেলায় তার বন্ধুরা তাকে ধাক্কা দিয়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল—এই গল্প কম হলেও পাঁচ বার শুনিয়েছে। বেচারা উঠতে যায়, আবার তার বন্ধুরা ধাক্কা দিয়ে তাকে পানিতে ফেলে দেয়। সে ধরেই নিয়েছিল মারা যাবে।

প্রথম বার এই গল্প শুনে সমবেদানায় পুষ্পের চোখ ভিজে উঠেছিল। শেষের দিকে কেন জানি হাসি পেত। সেই হাসি লুকানোর জন্যে খুব কষ্ট করতে হত। পুষ্পের নিজেরও কত কথা বলতে ইচ্ছে করত। সুযোগই পেত না। হয়তো কোনো একটা গল্প শুরু করেছে, অল্প কিছদর এগোবার পরই রকিব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে একট দাঁড়াও, আমার নানার

বাড়িতে আমাকে এক বার একটা রাজহাঁস কামড় দিয়েছিল। এই গল্পটা বলে নিই, পরে মনে থাকবে না, ভুলে যাব।

রাজহাঁস কামড়ের গল্প পুষ্প আগেও শুনেছে, তবু ভান করল যেন এই প্রথম বার শুনছে। চোখ বড়-বড় করে বলল, তারপর কী হল? কী ভয়ঙ্কর। তুমি গাছে উঠে গেলে?

কিছু-কিছু কল্পনা মিলে যায়, আবার কিছু-কিছু মেলে না। না-মেলা কল্পনার সংখ্যাই বোধহয় এক জন মানুষের জীবনে অনেক বেশি। গাড়ি কেনার কল্পনাটা হয়ত মিলবে না। পুষ্প ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। ড্রাইভার বলল, এখন কোন দিকে যাব? রকিব বলল, কোনো দিকে না, রাস্তায় চক্কর দাও। আর শোন, ইংরেজি ভালো লাগছে না, বাংলা কোনো গান থাকলে দাও।

আধুনিক না রবীন্দ্রসংগীত?

রবীন্দ্রই চলুক। ঠাণ্ডাঠাণ্ডা গান।

পুষ্প চোখ বন্ধ করে গান শুনছে। বাবু তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যাসেটে একটি মেয়ে কোমল স্বরে গাইছে, এসো কর স্নান নবধারা জলে। আহ্, বেঁচে থাকা কী সুখের।

পুষ্প একটু সরে এল রকিবের দিকে, নিচু গলায় বলল, চল না একটু যাত্রাবাড়ির দিকে যাই। যাবে? রাত তত বেশি হয় নি।

ওখানে কী?

ছোট মামার বাসা। নানিজান হয়ত এসেছেন ছোট মামার বাসায়, দেখা করে আসি। কত দিন নিজানকে দেখি না।

আরে দূরবাদ–দাও। চিপা গলি, আমার গাড়িই ঢুকবে না।

রকিব এমনভাবে আমার গাড়ি বলছে যেন এটা সত্যি-সত্যিই তার গাড়ি। গানের সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছে। পা নাচাচ্ছে।

কাঁচটা তুলে দাও তো পুষ্প। একটা সিগারেট ধরাব। হ্যান্ডেলটা ধরে ঘোরাও, কাঁচ অটোমেটিক উঠবে।

তুমি আজ এত সিগারেট খাচ্ছ কেন?

রোজ তো আর খাই না। ওয়ান্স ইন এ হোয়াইল। তুমি একটা টান দিয়ে দেখবে নাকি? টেস্ট করবে?

কী যে বল পাগলের মত!

পাগলের মতো কী আবার বললাম, বিদেশে মেয়েরাই এখন সিগারেট খায়। পুরুষরা ক্যান্সারের ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

তুমি ছাড় না কেন? তোমার ক্যান্সারের ভয় নেই?

আরে দূর, আমি হচ্ছি ছোট মানুষ। ছোট মানুষের ছোট অসুখ। আমার হবে সর্দি, আমাশা, গেঁটে বাত এইসব হা হা হ্যাঁ।

হাসির শব্দে পল্টু জেগে উঠেছে। জেগেই আর সে দেরি করল না। তারস্বরে কাঁদতে শুরু করল। রকিব বিরক্ত মুখে বলল, একটা চড় দাও তো। দাও একটা চড়।

চড় দেব কেন? কী করেছে সে?

ভ্যা-ভ্যা করছে শুনছ না?

করুক।

পুষ্প ছেলেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। সে কিছুতেই পোষ মানছে না। গলার আওয়াজ বাড়ছেই। রকিব বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছে। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে।

৫. জহিরের দাড়ি শেভ করবার ব্যাপারটা

জহিরের দাড়ি শেভ করবার ব্যাপারটা দেখার মতো। মোটামুটি একটা রাজকীয় আয়োজন। বারান্দায় ছোট্ট টেবিল আনা হয়, আয়না লাগানো হয়। গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি, স্যাভলন, ব্রাশ, সাবান, রেজার, আফটার শেভ। সব নিয়ে আসার পর গালে সাবান লাগানোর পালা। এই দৃশ্যটিও মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। জহির ব্রাশ ঘষছে তো ঘষছেই। মুখ সাবানে ভরে উঠছে, তবুব্রাশ ঘষার বিরাম নেই। নিশাত এক বার অবাক হয়ে বলেছিল, এরকম তুচ্ছ একটা ব্যাপারে এত সময় নষ্ট কর?

দাড়ি কাটা তুচ্ছ মনে হল তোমার কাছে?

কেটে ফেলে দিচ্ছ, এটা তুচ্ছ না?

না। এর নাম বিসর্জন। আয়োজন ছাড়া বিসর্জন হয় না।

বিয়ের আগে জহিরের এই দিকটি নিশাতের চোখে পড়ে নি। শুধু দাড়ি কাটা নয়, সব ব্যাপারেই জহিরের আয়োজনের বেশ বাড়াবাড়ি আছে। অফিসে যাবার ব্যাপারটাই ধরা যাক। পালিশ করা জুতোও সে পাতলা ন্যাড়া দিয়ে অনেকক্ষণ ঝাড়পোছ করবে। রুমাল ইস্ত্রি করবে। সাজসজ্জা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে আয়নার সামনে। এইসব ব্যাপারগুলি বিয়ের আগে নিশাতের চোখে পড়ে নি। চোখে পড়েছে যে এই মানুষটি খুব ফিটফাট। রুচিবান একজন মানুষ, যার গায়ে কখনো ইস্ত্রি ছাড়া কাপড় দেখা যায় না। যার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সবসময় আফটার শেভ লোশনের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধটা ভালো লাগে।

জহির টাই বাঁধতে-বাঁধতে নিশাতের ঘরে ঢুকল। নিশাতের ঘর মানে তার স্টুডিও। ছবি আঁকার সরঞ্জামে ঠাসা একটা ঘর। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছবির স্তুপ। নিশাত একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে। গত দু দিন এই ছবিটির জন্যে বেশ কিছুটা সময় দিয়েছে। লাইন-ওয়ার্ক শেষ হয়েছে, কিছু-কিছু জায়গায় রং পড়েছে।

জহির অবাক হয়ে বলল, কার পেইনটিং?

নিশাত বলল, চিনতে পারছ না?

পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার?

মহিলা বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? বাচ্চা একটা মেয়ে।

ওর ছবি আঁকছ কেন?

কোনো বাধা আছে?

বাধা থাকবে কেন? জানতে চাচ্ছি।

নিশাত হাসল। ছবিটির দিকে তাকিয়ে হাসল। ভালো হচ্ছে। অনেকদিন পর নিজের কাজ তার পছন্দমতো এগুচ্ছে। মন লেগে গেলে কাজ খুব দ্রুত এগোয়। অনেকদিন ধরেই কোনো কিছুতেই মন বসছে না। নিশাত চাকু দিয়ে পোট্রেটের চুল থেকে কিছু রং ঘষে

ঘষে তুলছে। চুল ঠিক আসছে না। মেয়েটির চুল ফ্লাফি ধরনের। এলোমেলো হয়ে থাকে, এখানে মনে হচ্ছে খুব গোছাননা চুল।

নিশাত।

বল।

আমার পোট্রেটে কবে হাত দেবে?

দেব খুব শিগগিরই।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করেছ নিশাত? পুরুষশিল্পীরা তাঁদের স্ত্রীদের মডেল বানিয়ে অসংখ্য ছবি আঁকেন, অথচ মহিলারা কখনো তাঁদের স্বামীদের মডেল বানান না।

আমি তোমার ছবি আঁকি নি বলে অন্যরাও আকবে না এমন তো কথা নয়। কেউকেউ নিশ্চয়ই আঁকে।

কেউ আঁকে না। মেয়েদের এই সাইকোলজিটা বেশ অদ্ভুত। আমার কলমটা পাচ্ছি না। একটু দেখবে?

টেবিলের উপরই তো থাকে।

এখন নেই। তোমার বান্ধবীর পুত্র নিয়ে যায় নি তো?

ও কলম নিয়ে কী করবে?

কিছু করবে না। হাতের কাছে পেয়েছে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কাইন্ডলি একটু খুজে দেখা বল পয়েন্টে আমি লিখতে পারি না।

অফিসে ফেলে আস নি তো?

অফিসে কি আমি কখনো কিছু ফেলে আসি?

তা আস না। দাঁড়াও, দেখি পাই কি না।

থাক, তোমাকে উঠতে হবে না। ছবি নিয়ে বসেছ, ডিসটার্ব করতে চাই না। শিল্পী-মানুষ–মুড কেটে গেলে মুশকিল।

ঠাট্টা করছ?

পাগল।

জহির ঘর থেকে বেরুল বিরক্ত মুখে। নিশাত তাকে এগিয়ে দিতে আসে নি। গত দিনও আসে নি। এটা কেন হচ্ছে জহির বুঝতে পারছে না। সম্পর্কে শীতলতা কি আসতে শুরু করেছে? নাকি জীবন-যাপনে মনোটনি? জহিরের প্রতি তার আগ্রহ কি কমে আসছে? কিছুটা নিশ্চয়ই কমেছে।

অফিসে পৌছেই জহির টেলিফোন করল। কিছু-কিছু কথা আছে মুখোমুখি বলা যায় না, অথচ টেলিফোনে খুব সহজেই বলা যায়।

নিশাত।

হ্যাঁ?

কি করছ?

তেমন কিছু না, গল্প করছি।

কার সঙ্গে গল্প করছ?

পুষ্প।

ও আচ্ছা তা হলে তুমি ব্যস্ত।

কিছু বলবে?

না।

তোমার কলমটা পাওয়া গেছে।

কোথায় ছিল?

যেখানে থাকার কথা সেখানেই ছিল। টেবিলের উপর। তুমি ভালো করে দেখ নি। তোমার জন্য যা খুব আনইউজুয়্যাল।

তা তো বটেই।

টেলিফোন রাখছি, কেমন?

জহির রিসিভার হাতে অনেকক্ষণ বসে রইল। নিশাত কখনন আগে টেলিফোন রাখে না। তার কাছে নাকি এটাকে অভদ্রতা মনে হয়। কিন্তু আজ সে সেই অভদ্রতাটাই করল, একবার জিজ্ঞেস করল না, টেলিফোন কেন করেছে।

পুষ্প খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পল্টু ঘরময় চক্রাকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে, মাঝে-মাঝে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—পারছে না। ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে। কিছুটা ব্যথা। নিশ্চয়ই পাচ্ছে, কিন্তু কাঁদছে না। আবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিশাত ব্যাপারটা খুব আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছে। শিশুদের মধ্যে এত অধ্যবসায় থাকে তা তার জানা ছিল না। জীবনের পরবর্তী সময়ে এই অধ্যবসায়টা থাকে না কেন কে জানে।

পুষ্প বলল, আপা, আমি যে প্রায়ই আপনার এখানে আসি, আপনি রাগ করেন না। তো?

না, করি না।

বিরক্ত হন নিশ্চয়ই।

মাঝে-মাঝে হই। সবসময় হই না।

পুষ্প মন-খারাপ করে ফেলল। নিশাত বলল, খুব প্রিয়জনদের উপরও আমরা মাঝে-মাঝে বিরক্ত হই। হই না? আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হচ্ছে আমার বাবা। মাঝে-মাঝে বাবার উপরও বিরক্ত হই। কাজেই তোমার এমন মুখ-কালো করার কিছু নেই।

আপনার বাবা বুঝি আপনাকে খুব ভালবাসেন?

তা বলতে পারব না। হয়তো বাসেন। ওঁর একটা গল্প তোমাকে বলব, শুনবে?

বলুন।

আমি তখন খুব ছোট। ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে পড়ি। বাবা কি জন্য জানি বকা দিয়েছেন, আমি খুব কাঁদছি। বাবা এসে বললেন, এখন থেকে নিয়ম করে দিলাম, যে আমার বকা খেয়ে কাঁদবে তাকেই একটা উপহার দেব। সত্যি-সত্যি চমৎকার একটা পুতুল কিনে আনলেন। এর পর থেকে ভাইবোনদের কেউ বকা খেয়ে কাঁদলেই দামি উপহার।

ও-মা, কী মজা!

আসল মজাটা এখনো বলিনি। কিছুদিন পর কী হল জান? বাবা বকা দিলে। আমরা কেউ কাঁদতে পারি না। কারণ বকা খেয়েছি, উপহার পাব এই আনন্দে এতই খুশি হয়ে যাই যে কান্না চলে যায়। আর না-কাঁদলে তো উপহার নেই।

কী সুন্দর গল্প।

এ-রকম সুন্দর-সুন্দর গল্প অনেক আছে। সব আমার বাবাকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তোমাকে বলব।

এখন একটা বলুন না।

না, এখন না। তুমি বরং তোমার বাবা সম্পর্কে বল।

আমার বাবা সম্পর্কে বলার মতো কিছু নেই আপা। খুব সাধারণ মানুষ। নিজেকে। নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের দিকে কখনো ফিরেও তাকান নি। মা মরে যাবার একুশ দিনের দিন আবার বিয়ে করেছেন। সংসার নাকি অচল হয়ে যাচ্ছে–বিয়ে না-করলেই না।

তুমি তখন কত বড়?

ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ছেলে আছে। আর আমাদের বোনদের বিয়ে কীভাবে হয়েছে জানেন আপা? ছেলে দেখতে এসেছে। বোনরা সবাই খুব সুন্দর তো, কাজেই দেখতে এসেই পছন্দ হয়ে গেছে। তখন বাবা বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্, বিয়ে হয়ে যাক। শুভস্য শীঘ্রম। কাজি ডেকে বিয়ে।

তোমার বাবা মনে হয় খুব করিৎকর্মা মানুষ।

মোটই না আপা। টাকা বাঁচানোর ফন্দি। বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হল না। আমাদের তিন বোনের বিয়ে হয়েছে কারো বিয়েতে অনুষ্ঠান হয় নি। বরপক্ষের ওরা অনুষ্ঠান করতে

চেয়েছে। বাবা বলেছেন, বিয়ে তো হয়েই গেছে, আবার অনুষ্ঠান কিসের? মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যান।

তোমার মনে হয় বাবার উপর খুব রাগ?

আগে রাগ হত, এখন হয় না।

এখন হয় না কেন?

জানি না আপা। এখন কেমন যেন মায়া লাগে। সেও তো গরিব মানুষ আপা। কোথা থেকে টাকা খরচ করবে?

তা তো বটেই।

নিশাত অবাক হয়ে দেখল, পুষ্পের চোখে পানি এসে গেছে। মনে হচ্ছে সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। খুবই সেনসিটিভ মেয়ে তো!

পুষ্প।

জ্বি?

চা খাবে?

না আপা।

তুমি কি খুব একা-একা থাক পুষ্প?

হ্যাঁ। ও কোথাও যাওয়া পছন্দ করে না, কাজেই কোথাও যাই না। কেউ আসেও না আমাদের এখানে শুধু ওর এক বন্ধু আসে মাঝে-মাঝে। তাকে আমার পছন্দ হয় না। শুধু আজেবাজে কথা বলে।

স্বামীর বন্ধুরা বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে সবসময় এরকমই করে। জহিরের এক বন্ধু আছে, মাঝে-মাঝে এমন সব কথা বলে যে ইচ্ছে করে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই।

পুষ্প হেসে ফেলল। বেশ শব্দ করে হাসি। হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বলল, অসময়ে উনি বাসায় আসেন, কেন জানি আমার ভালো লাগে না।

অসময়ে মানে কখন?

দুপুরের পর, আড়াইটা-তিনটার দিকে।

তুমি ওঁকে বলবে, যেন অসময়ে না আসেন।

ও আবার রাগ করবে। পল্টুর বাবার কথা বলছি। ওর চট করে রেগে যাবার অভ্যাস আছে।

তুমি তোমার অসুবিধার কথাটা বলছ, এতে ওঁর রাগ করবার তো কিছু নেই।

আমি তা বলতে পারব না আপা। তা ছাড়া মিজান সাহেব মানুষ হিসেবে খুব ভালো। সবার সঙ্গে রসিকতা করা ওঁর অভ্যাস। ওঁর মনে কোন পাপ নেই।

তাই বুঝি?

জ্বি আপা।

তবু তুমি ওঁকে বলবে যেন অসময়ে না আসেন। আমাদের দেশটা তো বিলেত আমেরিকা নয়। এ-দেশের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। ডিসেনসির ব্যাপার আছে। তাই না?

পুষ্প কিছু বলল না। নিশাত বলল, তোমার ওঁকে কেমন লাগে?

আমার পছন্দ হয় না।

অতিরিক্ত মেলামেশার একটা সমস্যা কি জান? কোনো-না-কোনভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যে লোকটিকে শুরুতে অসহ্য বোধ হয় একসময় দেখা যায় তাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে।

কী যে বলেন আপা!

আমি ঠিকই বলি। পনের-যোল বছরের বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েকে আমি দেখেছি, বুড়ো গানের মাস্টারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার নিজের কথা বলব?

বলুন।

না থাক। সব কথা এক দিনে বলতে নেই। কিছু কথা আরেক দিনের জন্যে ভোলা থাকুক।

টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। নিশাত টেলিফোন ধরল। ওপাশে জহিরের গলা।

নিশাত।

বল, শুনছি।

কি করছিলে?

তেমন কিছু না। তোমার কী হয়েছে বল তো! একটু পরপর...কি হয়েছে?

ভালো লাগছে না।

ভালো না-লাগলে চলে এস।

আমি ভাবছিলাম কি, বাইরে কোথাও গেলে কেমন হয়। ধর রাঙ্গামাটি বা কক্সবাজার।

হঠাৎ?

না, মানে–আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের সম্পর্কটা একটু কোল্ড যাচ্ছে।

এ-রকম ধারণা হবার কারণ কি বল তো?

না, মানে.....

যেতে চাইলে চল যাই। ঘুরে আসি। আমার তো কোনো কাজ নেই, আমি তো ঘরেই বসে থাকি।

তা হলে চলে এস না।

আচ্ছা আসছি। টেলিফোন রাখলাম, কেমন?

নিশাত রিসিভার নামিয়ে আসতে শুরু করল। মনের কিছু দরজা-জানালা এখন খুলতে শুরু করেছে। নিশাত পল্টুকে কোলে নিয়ে গায়ের ঘ্রাণ নিল। কি অদ্ভুত গন্ধ শিশুদের গায়ে!

৬. পুষ্পদের বাড়িওয়ালা আওলাদ সাহেব

পুষ্পদের বাড়িওয়ালা আওলাদ সাহেব একজন স্কুল-টীচার। স্কুল-টীচার হয়েও তিনি শুধুমাত্র নিজের রোজগারে ঢাকায় দুটি বাড়ি করেছেন। একটি সোবহানবাগে, অন্যটি কল্যাণপুরে। কল্যাণপুরের বাড়িতে তিনি নিজে থাকেন। সোবহানবাগের বাড়িটা ভাড়া দেন। বর্তমানে চেষ্টা-তদবির করছেন লোনের জন্যে। লোন পেলেই বাড়ি ভেঙে চারতলা দালান তুলবেন। এই ব্যাপারটা তিনি অনেকক্ষণ ধরে রকিবকে বোঝাচ্ছেন। মাস্টারদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে, তাঁরা সবাইকে তাঁদের ছাত্র মনে করেন। এবং মনে করেন কেউ তাঁদের কথা বুঝতে পারছেনা। আরো ভালোমতো বোঝনোদরকার। তিনি যে এই বাড়ি ভেঙে চারতলা দালান তুলতে চান, এটা রকিবকে বেশ কয়েক বার বললেন।

লোন পেয়ে গেলেই বাসা ছাড়তে হবে, বুঝতে পারতেছেন তো?

জ্বি, পারছি।

তখন এই অসুবিধা সেই অসুবিধা, এই রকম সতের ধরনের কথা বলতে পারবেন। না।

বলব না।

এইসব মুখের কথা সবাই বলে, কাজের সময় না। আমার বড় শ্যালক একটা বাড়ি করেছিল, বুঝলেন? একটা ভালো পার্টির কাছে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। পার্টি এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দিল। তারপর আর ভাড়া দেয় না। ভাড়া চাইতে গেলে বলে, ভাড়া দেব কেন, বাড়ি কিনে নিলাম না!

বলেন কী?

এই হচ্ছে দেশের অবস্থা।

তারপর আপনার বড় শ্যালক কী করলেন?

মামলা-মোকদ্দমা করছে, আর কী করবে? দু বছর হয়ে গেল—এক পয়সা ভাড়া দেয় নাই।

আমাকে দিয়ে ঐ ভয় নেই। এক তারিখে বেতন পাব, দুই তারিখে বাড়িভাড়া শোধ। সামনের মাসের এক তারিখে চলে আসব।

এই মাসটা আমি কী করব? আসতে হয় এই মাসে আসবেন। গোটা মাসের ভাড়া দেবেন। আর যদি তা না চান, মামলা ডিসমিস। বুঝলেন?

মামলা ডিসমিস করার দরকার নেই, আমি এই মাসেই আসব।

ভালো কথা, চাবি নিয়ে যান। আমি সপ্তাহে একদিন এসে বাড়ি দেখে যাব। বাড়ি হচ্ছে নিজের সন্তানের মতো। দেখাশোনা না করতে পারলে ভালো লাগে না। আপনার স্ত্রীকে বলে দেবেন।

কি বলে দেব?

এই যে সপ্তাহে-সপ্তাহে আসব, এইটা আর কি।

জ্বি, বলে দেব।

উঠবেন কবে?

দুই-এক দিনের মধ্যে।

পুষ্প চৈত্র মাসে বাড়িতে উঠতে রাজি হল না। চৈত্র মাসে নাকি নতুন কোন কাজ শুরু করতে নেই। সে মাস শেষ হলে নতুন বাড়িতে উঠবে। এর মধ্যে অল্প-অল্প করে গুছিয়ে রাখবে। নতুন বছরে সে গোছাননা বাড়িতে গিয়ে উঠবে।

বাড়ি গোছানোর পর্ব শুরু হল। বেতের চেয়ার কেনা হল। জানালার নীল পর্দা। একটা ছোট পড়ার টেবিল। বুক-কে। একটা চৌকি। ভেতরের বারান্দায় পাতা থাকবে। হঠাৎ আত্মীয়স্বজন এসে পড়লে থাকবে। পুষ্প তার নিজের টাকা ভেঙে রান্নাঘরের জন্যে একটা মিটসেফ কিনল। প্লাস্টিকের লাল রঙের বালতি।

নতুন সংসার শুরু করার প্রচণ্ড আনন্দ আছে। পুষ্প ছোটখাটো একটা-কিছু কেনে, আনন্দে চোখ ছলছল করতে থাকে। দোকানে গেলেই বেহিসাবী হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কয়েক বার এরকম হয়েছে। এক শ পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনেছে চিনামাটির লবণদান। জিনিসটা এত সুন্দর যে এতে লবণ রাখতে মায়া লাগে। সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। প্রায়ই সে ভাবে, তার যদি প্রচুর টাকা থাকত, কী সুন্দর করেই-না সে ঘর সাজাত! যে-ই দেখত

সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেত। এক দিন নিশ্চয়ই তার টাকা হবে। প্রচুর টাকা। তখন হয়তো ঘর সাজাতেই মন চাইবে না।

পুষ্প ছেলেকে কোলে নিয়ে নিশাতের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে কলিংবেল টিপল। সে আজ একটা বিশেষ কারণে এসেছে। পল্টুকে এখানে রেখে যাবে যাত্রাবাড়িতে। তার নানিজানকে নিয়ে এসে তার নতুন সংসারের শুরুটা দেখাবে।

কি ব্যাপার পূ? বেশ কদিন পর তোমাকে দেখলাম?

খুব ব্যস্ত আপা। আমাদের নতুন বাসাটা সাজাচ্ছি।

কী রকম সাজাচ্ছ, এক দিন গিয়ে দেখে আসতে হয়।

আপনি কি সত্যি যাবেন?

হ্যাঁ, যাব। তোমার জন্যে একটা ছবি আঁকছি, সেই ছবি তোমাদের বাসায় সুন্দর একটা জায়গায় টাঙিয়ে দিয়ে আসব।

কি ছবি আপি? একটু দেখি?

না, এখন দেখা যাবে না।

আপা, আপনি কি পল্টুকে একটু রাখবেন? ঘন্টা দুয়েকের জন্যে।

ঘন্টা দুয়েকের জন্যে তো রাখতে পারব না। কারণ এখন যাচ্ছি মার বাসায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে চাইলে রেখে যাও।

তা হলে তো আপা আরো ভালো হয়।

খুব সাজগোজ করেছ দেখছি! যাচ্ছ কোথায়?

নানিজানের কাছে যাব। তারপর তাঁকে আমার নতুন বাসা দেখাতে নিয়ে আসব।

চমৎকার!

এই ব্যাগে ওর বাড়তি জামা আর প্যান্ট আছে।

টেবিলের উপর রেখে দাও।

আমি যাই আপা?

যাও।

যেতে গিয়েও পুষ্প হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, আপনি এত ভালো কেন আপা বলুন তো? জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একটা ভুল হয়ে গেছে। রকিব যদি কোনো কারণে অফিস ফাঁকি দিয়ে চলে আসে, তা হলে ঘর বন্ধ দেখলে রেগে যাবে। একটা চিঠি লিখে দরজার সামনে টাঙিয়ে যেতে হবে।

অবশ্যি চিঠি দেখলেও সে রাগ করবে। তবে নির্বোধ বলে গাল দিতে পারবে না। সে তো বুদ্ধি করে চিঠি লিখে যাচ্ছে।

পুষ্প লিখল, আমি নিজানকে দেখতে যাচ্ছি। চারটা বাজার আগেই চলে আসব। রাগ করবে না কিন্তু।

শেষ লাইনটা লেখা কি ঠিক হচ্ছে? অন্য কেউ যদি পড়ে? লাইনটা কাটতে ইচ্ছা। করছে না। আবার রাখতেও অস্বস্তি লাগছে।

ভাবি আসব? অধমের নাম মিজান—যদি ভুলে গিয়ে থাকেন। মিজানুর রহমান।

পুষ্প মুখ তুলে ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল।

কোথাও বেরুচ্ছেন বুঝি? সাজসজ্জা দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।

জ্বি।

সঙ্গে গাড়ি আছে, আসুন নামিয়ে দিই।

গাড়ি লাগবে না। আমি কাছেই যাব। ঐ তো পাশের বাসা।

আপনি কি আমাকে ভয় পান ভাবি?

জ্বি-না। ভয় পাব কেন? চা করে আনি? চা খাবেন?

আনুন। আপনার পুত্র কোথায়?

ওকে পাশের বাসায় নিয়ে গেছে, এক্ষুণি দিয়ে যাবে।

আই সী।

পুষ্প চা বানিয়ে নিয়ে এল। মিজান চেয়ারে বসে আছে। মুখের ভঙ্গি গম্ভীর। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট কিন্তু সিগারেট টানছে না। সে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল।

আপনি কি জন্যে আমাকে ভয় পান?

ছিঃ, কী বলেন ভাই! ভয় পাব কেন?

ভয় পান বলেই তো মিথ্যা কথাটা বললেন, ছেলে পাশের বাসায় আছে, এক্ষুণি দিয়ে যাবে যাতে আমি বুঝতে পারি যে এখানে আমাকে ভদ্র হয়ে থাকতে হবে। বেচাল কিছু করা যাবে না।

পুষ্প ক্ষীণ গলায় বলল, আমি সত্যি কথাই বলছি ভাই। নিশাত আপা এক্ষুণি বাবুকে দিয়ে যাবে।

মিজান সিগারেট ফেলে দিয়ে চায়ের কাপে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, অন্ধকারে একটি সুন্দরী যেমন অসুন্দরী মেয়েও তেমনা পার্থক্যটা হচ্ছে আলোতে।

আপনি এ-সব কী বলছেন?

সত্যি কথাই বলছি। আপনার কি ধারণা, সুন্দরী মেয়ে আমি এর আগে দেখি নি? আপনাকে প্রথম দেখলাম?

ছিঃ ছিঃ ভাই। আমি যদি কোনো কারণে আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি আমাকে মাফ করে দিন।

আমাকে দেখলেই আপনি এমন একটা ভাব করেন যেন আমি আপনাকে রেপ করতে এসেছি।

পুষ্প কেঁদে ফেলল। সে কী বলবে বা কী করবে বুঝতে পারছে না। সিঁড়িতে শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিশাত আপা বাবুকে নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। সে কি চিৎকার করে নিশাত আপাকে ডাকবে? এটা কি ঠিক হবে? এই লোকটি হয়তো ঠাট্টা করছে। এর

অভ্যাস হচ্ছে ঠাট্টা করা। সবার সঙ্গেই ইনি ঠাট্টা করেন। রকিব কত বার বলেছে। পুষ্প।

পুষ্প চমকে উঠল। কী আশ্চর্য, নাম ধরে ডাকছে কেন? পুষ্প থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে কি ছুটে বেরিয়ে যাবে?

নাম ধরে ডাকলাম বলে চমকে উঠলেন নাকি? চমকে ওঠার কিছু নেই। মানুষের নাম দেওয়া হয় ডাকার জন্যে। তা ছাড়া কেউ তো তা জানতে পারছে না। আমি যদি এখন আপনাকে আরো মধুর কোনো নামে ডাকি তা হলেও কিছু যায়-আসে না।

আপনার কী হয়েছে। আপনি এরকম কথা বলছেন কেন?

আমার কিছুই হয় নি। আমি ভালো আছি। আপনি কাঁদছেন কেন?

মিজান ভাই, আজ আপনি চলে যান। অন্য আরেক দিন আসবেন।

এসেছি যখন একটু বসি। রোজ-রোজ আসা তো মুশকিল। কই, আপনার বান্ধবী তো এখনো বাচ্চা নিয়ে এল না?

মিজান উঠে দাঁড়াল। হয়তো এবার চলে যাবে। শুধু-শুধুই সে ভয় পাচ্ছিল। পুষ্প শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। মিজান দরজার সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল। এক বার তাকাল পুষ্পের দিকে এবং খুব সহজ ভঙ্গিতে দরজার হুক তুলে দিল।

পুষ্প কাঁপা গলায় বলল, দরজা বন্ধ করছেন কেন?

কেন বন্ধ করছি বুঝতে পারছ না?

মিজান ভাই, আমি আপনার পায়ে পড়ছি।

তুমি শুধু-শুধু ভয় পাম্। কেউ কিছু জানবে না। আমি তো কাউকে কিছু বলবই না, তুমিও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। লোকলজ্জা বড় কঠিন জিনিস।

পুষ্প চিৎকার করে উঠতে চাইল, মুখ দিয়ে স্বর বেরুল না। রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতে চাইল, ছুটে যেতে পারল না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন।

এই লোকটি তার গায়ে হাত দিচ্ছে কেন? এ কে? আমি চিৎকার করতে চাই। আমাকে চিৎকার করতে দাও। এই লোক আমাকে চিৎকার করতে দিচ্ছে না। মুখ চেপে ধরে আছে। আমা, আম্মা আমাকে বাঁচান আমা। আমি মরে যাচ্ছি।

পুষ্প জ্ঞান হারাল। মিজান তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরাল। আয়নায় মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হচ্ছে না। সিগারেটটা ধীরেসুস্থে শেষ করা যেতে পারে।

আয়নায় পুষ্পকে দেখা যাচ্ছে। অচেতন অর্ধনগ্ন একটি রূপবতী তরুণী হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে। শঙ্খের মতো সাদা বুক নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। অপূর্ব দৃশ্য! মিজান মুগ্ধ হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃশ্যটি সরাসরি দেখার চেয়ে আয়নায় দেখতে বেশি ভালো লাগছে।

মিজান সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে শোবার ঘরের দরজা ভিড়িয়ে দিল, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

পুষ্প অচেতন অবস্থাতেই বিড়বিড় করে তার মাকে ডাকছে।

৭. নিশাত বলল, ছটফট করছ কেন

নিশাত বলল, ছটফট করছ কেন? চুপ করে বসে থাক। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন।

কটা বাজে।

পাঁচটা পঁচিশ।

ও আসছে না কেন?

আসবে। অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়, আসতে সময় লাগবে না?

আপনি চলে যাবেন না তো?

না, আমি আছি। আমি এক সেকেণ্ডের জন্যেও এই ঘর থেকে যাব না।

আপা আমি কাঁদতে পারছি না।

তোমার কাঁদার কোনো দরকার নেই।

আর কেউ জানে না তো?

কেউ জানে না।

আপনি কাউকে বলবেন না। আপনি কাউকে বললে আমি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ব।

আমি কাউকে কিছু বলব না।

নিশাত উঠে এসে পুষ্পের গায়ে চাদর ভালো করে জড়িয়ে দিল। পল্টু চোখ বড়বড় করে মাকে দেখছে।

আপা!

বল।

পল্টু কি কিছু বুঝতে পারছে?

কিছু বুঝতে পারছে না। তুমি একটু শুয়ে থাক।

না। আপনি কিন্তু যাবেন না।

বললাম তো আমি যাব না।

কটা বাজে আপি?

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

আমার কেমন যেন গা ঘিনঘন করছে। আপা আমার বমি আসছে।

বাথরুমে যাও, বমি করে আস। এস আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পুষ্প বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারল না, হড়হড় করে বমি করল। সেই বমির অনেকখানি এসে লাগল নিশাতের শাড়িতে।

আপা, আপনাকে নোংরা করে ফেলেছি।

কোনো অসুবিধা নেই। আমি পরিষ্কার করে নেব। তুমি যাও, হাতমুখ ধুয়ে এস।

আমি আরেক বার গোসল করব আপা।

তুমি একটু পরপর গোসল করছ। বড় একটা অসুখ বাধাবে।

আমি এখন গোসল করতে না পারলে মরে যা আপা।

পুষ্প বাথরুমের দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। শাওয়ার খুলে দিয়েছে। প্রচণ্ড তোড়ে পানি নেমে এসেছে। পানির নিচে মাথা দিয়ে পুষ্প বসে আছে। যেন সে মানুষ নয়। পাথরের কোনন মূর্তি।

নিশাত দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে পল্টুকে কোলে করে তার নিজের ঘরে গেল। পুষ্প বাথরুম থেকে বেরুবার আগেই দ্রুত কয়েকটা টেলিফোন করা দরকার। প্রথমেই কথা বলা দরকার বাবার সঙ্গে। বাবা খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি দিতে পারবেন।

হ্যালো বাবা।

কে, নিশু বেটি? কি হয়েছে রে মা?

একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়েছে বাবা।

বল শুনি।

তুমি কি এক্ষুণি আসতে পারবে?

না, পারব না। কোমরের ব্যথা শুরু হয়েছে। কী হয়েছে বল?

আমার পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছি না? সেই মেয়েটি রেপড় হয়েছে। পল্টুর মা। বাবা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ফরহাদ সাহেব মেয়ের কথার জবাব দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

বাবা!

শুনছি মা।

এখন আমি কী করব বল? মেয়েটির স্বামী এখনো ফেরে নি।

মেয়েটির শরীরের অবস্থা কেমন? হাসপাতালে নিতে হবে?

না, তা হবে না। আমি কী করব? পুলিশে খবর দেব?

তুমি কিছু করবে না। কাউকে খবর দেবে না। মেয়েটির স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করবে।

পুলিশের কোনো বড় অফিসারের সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে?

হ্যাঁ, আছে। কিন্তু মা, বী পেশেন্ট, মন দিয়ে আমার কথা শোন। তুমি কিছু করবে না। মেয়েটির স্বামী আসুক।

উনি তো এখনন আসছেন না!

মা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এটা তো তোমার কোনো ব্যাপার না।

একটা মেযে রেপড় হয়েছে। আমি নিজেও একটা মেয়ে। আমার কাছে কেমন লাগছে তুমি বুঝতে পারছ না। মনে হচ্ছে পারবে না।

নিশু মা, একটা কথা শোন.....

আমি পরে কথা বলব।

নিশাত টেলিফোন নামিয়ে পুষ্পের ঘরে ছুটে গেল। পুষ্প এখনো বাথরুমে। শাওয়ার থেকে প্রবল বেগে পানি ঝরছে।

পুষ্প, পুষ্প—এই পুষ্প।

জ্বি।

বেরিয়ে এস।

পুষ্প জবাব দিল না।

তুমি যদি এই মুহূর্তে বের না হও, আমি কিন্তু চলে যাব।

পুষ্প শাওয়ার বন্ধ করে বের হয়ে এল। তার চোখ টকটকে লাল। শীতে সে কাঁপছে। ঠোঁট নীল হয়ে আছে। নিশ্চয়ই জ্বর এসেছে।

কটা বাজে আপা?

জানি না কটা বাজে। তুমি শুকনো কাপড় পর। কম্বলটল কিছু-একটা গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়।

ঐ বিছানায় আমি কোনোদিন শুতে পারব না।

ঠিক আছে, বিছানায় শুতে হবে না। চাদর পেতে দিচ্ছি।

আপা, আপনার শাড়ি নোংরা হয়ে আছে।

তোমাকে শুইয়ে রেখে আমি যাব, দুই-তিন মিনিট লাগবে।

না আপা, আপনি যাবেন না।

বেশ, আমি যাব না।

মেঝের বিছানায় শোয়ামাত্র পুষ্প ঘুমিয়ে পড়ল। পল্টু ঘুমুচ্ছে। নিশাত মার পাশে তাকে শুইয়ে নিজের ঘরে এসে কাপড় বদলাল। ঘরে টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে বাবার টেলিফোন।

জহির এখনন ফিরছে না। রাত আটটার আগে সে সাধারণত ফেরে না। আজ যদি সকাল-সকাল আসত। নিশাত ঘরে তালা লাগিয়ে বারান্দায় এসে দেখল—পর বাবা সিড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। তার এক হাতে বাজারের ব্যাগ, অন্য হাতে দড়িতে বাঁধা কলা। নিশাতের চোখে চোখ পড়ামাত্র সে চোখ নামিয়ে নিল।

রকিব সাহেব।

রকিব অবাক হয়ে তাকাল।

আপনি একটু আমার ঘরে আসুন।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আসুন।

হাত গুটিয়ে রকিব বসে আছে। কলাগুলো তার কোলের উপর রাখা। সে ছোট-ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সে মাথা নিচু করে শুনছে। মাঝে-মাঝে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে সিগারেট বের করে আবার পকেটে রেখে দিল। নিশাত বলল, আপনি সিগারেট খান, কোনো অসুবিধা নেই।

পল্টু। পল্টু কোথায়?

আছে, ওর মার কাছেই আছে। আপনাকে শক্ত হতে হবে, বুঝতে পারছেন? এখন। যান, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম ভাঙাবেন না। অপেক্ষা করবেন। আপনার স্ত্রীর মানসিক অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?

রকিব জবাব দিল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিশাত বলল, পুলিশে খবর দিতে হবে। আমি অনেক আগেই দিতাম। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

পুলিশ?

হ্যাঁ, পুলিশ। এত বড় একটা ঘটনার পরও আপনি পুলিশে খবর দেবেন না?

রকিব চুপ করে রইল। নিশাত বলল, আপনি আপনার বন্ধুকে শাস্তি দিতে চান না?

চাই।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চান। কেন চাইবেন না?

লোক জানাজানি হবে।

তা তো হবেই। কিন্তু আজ যদি ঐ লোকটির শাস্তি না হয়, তা হলে কী হবে ভেবে দেখুন। ও বুক ফুলিয়ে অন্য কোনো মেয়ের কাছে যাবে। ঠিক একই অবস্থা হবে অন্য একটা মেয়ের।

আমি একটু ভেবে দেখি।

এর মধ্যে ভেবে দেখার কিছু আছে কি?

রকিব জবাব দিল না। নিশাত বলল, যান, আপনার স্ত্রীর কাছে যান। আমিও আসছি।

রকিব উঠে দাঁড়াল। সবগুলো কলা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। রকিব নিচু হয়ে কলাগুলি তুলছে। মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

রকিব সাহেব, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যান। আমি একটু পরেই আসছি। রকিব ঘর থেকে বের হতে আবার দরজায় একটা ধাক্কা খেল। কলাগুলি আবার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। টেলিফোন বাজছে। নিশাত ফোন ধরল।

মা নিশু!

হ্যাঁ বাবা।

একটু পরপর টেলিফোন করছি, কৈউ ধরছে না।

আমি ছিলাম না।

মেয়েটির ব্যান্ড কি এসেছে?

হ্যাঁ, এসেছে।

পুলিশ কেস করতে চায়?

কেন চাইবে না? চায়।

এখন হয়তো ঝোঁকের মাথায় চাচ্ছে। তারপর যখন চারদিকে হৈচৈ শুরু হবে, তখন মাথার চুল ছিড়বে।

তখনকার কথা তখন হবে।

আমাদের সোসাইটিকে তুমি চেন না মা।

আমার চেনার দরকার নেই। বাবা, তুমি কি তোমার গাড়িটা পাঠাতে পারবে?

পারব। গাড়ি দিয়ে কী হবে?

থানায় যাব।

নিশু মা, আমার একটা কথা শোন।

তুমি গাড়িটা পাঠাও তো বাবা!

নিশাত টেলিফোন নামিয়ে ঘড়ি দেখল। সাতটা পাঁচ বাজে। জহিরের আসতে এখনও অনেক দেরি।

সে তালাবন্ধ করে পাশের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। বেশ কয়েক বার কলিংবেল টেপার পর রকিব দরজা খুলে দিল।

পুষ্প মেঝেতে মাথা নিচু করে বসে আছে। নিশাতকে ঢুকতে দেখেই বলল, ও পুলিশের কাছে যেতে চাচ্ছে না আপা। তুমি আমাকে নিয়ে চল। ওরা তো টাকা নেবে, তাই না? আমার কাছে টাকা আছে। আমার নানিজান আমাকে পাঁচ হাজার টাকা। দিয়েছেন।

পুষ্প হু-হু করে কেঁদে ফেলল। রকিব চেয়ারে বসে আছে। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

আপা, ও আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না আপা।

তুমি যদি চাও আমি নিয়ে যাব। এক্ষুণি নিয়ে যাব। আর শুনুন ভাই, আপনি কেন নিতে চাচ্ছেন না?

রকিব জবাব দিল না। পল্টু জেগে উঠেছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে তার মাকে ধরতে গেল। পুষ্প বাঁ হাতে এক ঝটকা দিয়ে তাকে ফেলে দিল। এই শিশু মার কাছ থেকে। কখনন এরকম ব্যবহার পায় নি। সে এতই অবাক হল যে কাঁদতে পারল না। চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল। অভিমানে তার ঠোট বেঁকে যাচ্ছে। চোখ ছলছল করছে।

৮. মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ

মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ তাকিয়ে আছেন। পুলিশেরা কোনো ব্যাপারেই কৌতূহলী হয় না। কৌতূহল ও বিস্ময় তাদের থাকে না। কিন্তু এই অফিসারটির গলায় খানিকটা আগ্রহ যেন আছে। তিনি নিশাতের চোখে চোখ রেখে বললেন, বলুন।

আমি কি একটু নিরিবিলিতে বলতে পারি?

থানা হচ্ছে একটা বাজার। মাছের বাজার। এর মধ্যে নিরিবিলি কোথায় পাবেন! যা বলতে চান এর মধ্যে বলতে হবে।

এর মধ্যে আমি কিছু বলতে পারব না।

বসুন, দেখি কি করা যায়।

অফিসার ইনচার্জ অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অতি দ্রুত মোটা খাতায় কী সব লিখতে লাগলো। এর মধ্যে টেলিফোন আসছে। রোগা একটা লোক প্রতি বারই দূর থেকে উঠে এসে টেলিফোন ধরছে, যদিও টেলিফোনের কাছেই অন্য একজন লোক বসে আছে। হাত বাড়ালেই সে টেলিফোন ধরতে পারে। ধরছে না। ঘরজোড়া বিরাট একটা টেবিল। রাজ্যের কাগজপত্র সেখানে। সেইসব কাগজপত্রের উপর প্লাস্টিকের বড় থালায় বানাননা পান। দেয়ালে বড় একটা ঘড়ি। ঘড়িটা পনের মিনিট ফাস্ট। ঘরের এক কোথায় কোমরে দড়ি বাঁধা দাড়িওয়ালা দু জন লোক বসে আছে। এরা প্রচণ্ড মার খেয়েছে। এক জনের ঠোট কাটা। কাটা ঠোঁট বেয়ে রক্ত পড়ছিল। সেই রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে। লোকটি

কিছুক্ষণ পরপর ও আল্লা গো বলে চেচিয়ে উঠে কাঁদছে। সেদিকে কেউ কোনো রকম গুরুত্ব দিচ্ছে না।

নিশাত বলল, আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করব?

হাতের কাজটা সেরে নিই। ওয়াসিম, রেকর্ড-রুমটা খুলে দাও। যান, আপনারা ঐ রুমে গিয়ে বসুন। ওয়াসিম, ওঁদের নিয়ে যাও। আমি দু-তিন মিনিটের মধ্যে চলে আসব।

সেই রেকর্ড-রুমেও তারা পনের মিনিটের মতো বসে রইল। একটা ছেলে এসে দু কাপ চা এবং প্লেটে করে পান দিয়ে গেল। এই ঘরটা বাথরুমের কাছে। বিকট গন্ধ আসছে। ঘোট ঘর, কিন্তু আলো খুব কড়া। দু শ পাওয়ারের একটা বা জ্বলছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ ককর করে।

পুষ্প চুপচাপ বসে আছে। একটি কথাও বলছে না। নিশাত দু-একটা টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করছে। পুষ্প জবাব দিচ্ছে না। মাঝে-মাঝে একটু যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। খুব সম্ভবত তার জ্বর।

শরীর খারাপ লাগছে?

না।

বসে থাকতে ভালো লাগছে না, তাই না?

পুষ্প জবাব দিল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বাইরে ঘন অন্ধকার, দেখার কিছু নেই। তবু পুষ্প মনে হয় অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে।

আমি অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না। ইচ্ছা করে বসিয়ে রাখি নি। আপনারা মনে হচ্ছে কোনো রেপ কেস রিপোর্ট করতে এসেছেন, তাই না?

নিশাত বিস্মিত হয়ে বলল, হ্যাঁ।

এগার বছর পুলিশে চাকরি করছি, কিছু-কিছু বুঝতে পারি। আমার নাম নুরুদ্দিনপুলিশ ইন্সপেক্টর। পুরো ঘটনা বলুন। ঘটনাটা কখন ঘটল? * নিশাত কাল পুষ্পের দিকে। পুষ্প মাথা নিচু করে বসে রইল। নুরুদ্দিন বললেন,

আপনি যা জানেন তাই বলুন। ওনার সঙ্গে আমি পরে কথা বলব।

নিশাত গুছিয়ে কিছু বলতে পারল না। তার বারবারই মনে হল অফিসারটি মন দিয়ে কিছু শুনছেন না। বারবার নড়াচড়া করছেন। কথার মাঝখানে দুবার উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে থুথু ফেললেন। একবার নিশাতকে চমকে দিয়ে খুবই উচু গলায় ডাকলেন, ওয়াসিম, ওয়াসিম। ওয়াসিম নামের কেউ-একজন এসে দাঁড়াল।

নিশাত কথা বন্ধ করে চুপ করে রইল। নুরুদ্দিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, গাড়ি এসেছে?

জ্বিনা স্যার। চাকা নাকি পাংচার হয়েছে।

চাকা ঠিক করতে সারা দিন লাগে? যান দেখুন কী ব্যাপার। দশ মিনিটের ভেতর গাড়ি চাই। যান যান, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

ওয়াসিম চলে যেতেই নিশাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপর কী হল বলুন।

যা বলার বলে ফেলেছি। এর বেশি বলার কিছু নেই।

নুরুদ্দিন তাকালেন পুষ্পের দিকে। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার স্বামী আসেন নি কেন? ওনার কি কেইস ফাইল করার ইচ্ছা নেই?

পুষ্প জবাব দিল না। সে এখনো জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

আপনি কেইস করতে চান?

হ্যাঁ।

আপনি গোসল করেছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

বেশ কয়েকবার, তাই না?

হ্যাঁ।

এইখানেই একটা সমস্যা করেছেন। মেডিকেল রিপোর্টে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে না।

নিশাত বলল, রিপোর্টে কিছু না পাওয়া গেলে কি কেইস হবে না?

অবশ্যই হবে। তবে যদি পাওয়া যায় তা হলে আমি আজ রাতেই ৩৭৬ ধারায় ভদ্রলোককে গ্রেফতার করব। এটা নন-বেইলেবল। কাজেই বেল হবে না। মিজান সাহেবের ঠিকানা কি জানা আছে?

পুষ্প বলল, না।

আপনার স্বামী নিশ্চয়ই জানেন।

হ্যাঁ।

আমরা ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। চলুন যাওয়া যাক।

কোথায় যাব?

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ডাক্তারি পরীক্ষাটা হয়ে যাক। এই জাতীয় : কেইসের শুরুটা খুব ঝামেলার। অনেকেই এ-সব ঝামেলার ভেতর দিয়ে যেতে চান না।

নিশাত বলল, কি ধরনের শাস্তি হতে পারে বলতে পারেন?

পারি। প্রমাণ করতে পারলে কুড়ি বছরের সাজা হয়ে যাবে।

প্রমাণ করা কি শক্ত?

হ্যাঁ, শক্ত। বেশ শক্ত। তবে ভিকটিমের মনের জোর যদি থাকে তা হলে পারা যায়।

পুষ্প বলল, আমি ডাক্তারি পরীক্ষা করাব না। আমি বাসায় চলে যাব।

নুরুদ্দিন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। শান্ত গলায় বললেন, অসুবিধাটা কোথায়? মহিলা-ডাক্তাররা আপনাকে পরীক্ষা করবেন।

আমি বাসায় চলে যাব।

দশ মিনিটের ব্যাপার।

এক বার তো বললাম, আমি বাসায় যাব।

যদি আপনি মেডিকেল টেস্টটা করান তা হলে আমি এক ঘন্টার মধ্যে এই হারামজাদাকে ধরে হাজতে ঢুকিয়ে দেব। আর যদি না করান, সে রাতের বেলা আরামে ঘুমুবে। হয়তো অন্য কোনো মেয়ের কাছে যাবে। আমি নিজে খুব যে একজন অনেস্ট অফিসার, এটা দাবি করব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই ভদ্র অপরাধীগুলিকে ধরতে চাই। তাদের চোদ্দ পুরুষের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চাই। আপনারা যদি সাহায্য না করেন কীভাবে করব?

আমি বাসায় যাব।

নিশ্চয়ই যাবেন। মেডিকেল কলেজের ঝামেলাটা মিটিয়েই চলে যাবেন। আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। একট পরপর সে ফুঁপিয়ে উঠছে। নুরুদ্দিন বললেন, যে-ব্যাপারটা আজ আপনার জীবনে ঘটেছে, আপনার মেয়ের জীবনেও এটা ঘটতে পারে। পারে না? চলুন রওনা হই।

পুষ্প উঠে দাঁড়াল।

নিশাত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে-ঘরটায় বসে অপেক্ষা করছে, এটা সম্ভবত নার্সদের কমনরুমজাতীয় ঘর। নার্সরা আসছে-যাচ্ছে। মোটামুটি একটা বাজারের মতো ব্যাপার। এরা কেউ নিশাতকে তেমন লক্ষ করছে না। তবে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা নুরুদ্দিনকে দেখছে কৌতূহলী হয়ে এক জন জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার স্যার?

নুরুদ্দিন হাই তুলে বললেন, কোনো ব্যাপার না। আপনাদের দেখতে এলাম। আপনারা ভালো আছেন?

পুলিশ অফিসারের এই ভঙ্গিটি নিশাতের বেশ পছন্দ হল। খুবই স্বাভাবিক আচরণ। যেন কিছুই হয় নি। ব্লাড-প্রেশার মাপাবার জন্যে এক জন রুগীকে নিয়ে এসেছেন। সারাটা পথ রেপ কেস প্রসঙ্গে বা মিজান সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি, বরং প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কয়েকটা নেড়িকুত্তা জটলা পাকাচ্ছিল, তাতে কী সমস্যা হল সেই গল্প শুরু করলেন। মন্ত্রী টেলিফোনে পুলিশের সাহায্য চাইলেন। পুলিশ বলল, নেড়িকুত্তা তো স্যার আমাদের ব্যাপার না। এটা মিউনিসিপ্যালেটির ব্যাপার। প্রতিমন্ত্রী রেগে আগুন, মিউনিসিপ্যালেটি বুঝি

না আপনাদের অ্যাকশন নিতে বলেছি, আপনারা অ্যাকশন নিন। প্রতি রাতে বাড়ির সামনে রাজ্যের কুকুর ঘেউঘেউ করবে, তা হলে আপনারা আছেন কি জন্যে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ফায়ার ওপেন করতে হলে এক জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগে। আমরা তা হলে এক জন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলি?

প্রতিমন্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে বললো, এই সামান্য ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট লাগবে?

জ্বি স্যার লাগবে। গুলী কোনো সামান্য ব্যাপার না। এখন বাজে রাত তিনটা। আবাসিক এলাকায় গুলী চলবে। সবাই টেলিফোন করবে পত্রিকা অফিসে। পত্রিকার রিপোর্টাররা আসবে আমার কাছে। আমি তাদের পাঠাব আপনার কাছে। সম্পাদকীয় লেখা হবে। প্রেসিডেন্ট তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি....।

থামুন। আপনাকে কিছু করতে হবে না।

নিশাত বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক এইসব বলছেন পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে। এটা নিশাতের কাছে চমৎকার লাগল। এক জন সেনসেবল মানুষ।

এই যে এখন তারা দুজন মুখোমুখি বসে আছে, ভদ্রলোক একটি কথাও বলছেন। না—কারণ তাঁর কথা বলার প্রয়োজন নেই। কথা যারা বেশি বলে তারা কাজ তেমন করতে পারে না। এই অফিসারটি নিশ্চয়ই কাজের।

নুরুদ্দিন সাহেব!

বলুন।

এই জাতীয় কেইস কি আপনাদের কাছে অনেক আসে?

না। খুব কম আসে। লোকলজ্জার ভয়েই কেউ আসে না। যা আসে লোয়ার ক্লাস থেকে। রিকশাওয়ালা, মজুর—এই রকম। লোকলজ্জার ভয় ওদের তেমন নেই, আমাদের যেমন আছে। তা হয়তো ঠিক।

একেবারেই যে হয় না তা নয়। কিছু-কিছু হয়। মাঝপথে সেইসবও নষ্ট হয়ে যায়। পত্রিকাওয়ালারা বড় ঝামেলা করে। নানান রকম কেচ্ছাকাহিনী ছাপে। ধর্ষণের খবরগুলি যেন একটা চাটনি। ছবিটবি বক্স করে ছেপে দেয়। কোনো-কোনো খবরে ধর্ষণের বর্ণনাও থাকে। পড়লে মনে হবে পর্নোগ্রাফী। যিনি লিখেছেন, তিনি লেখার সময় খুব মজা পেয়েছেন এটা বোঝা যায়। আপনার কখনো চোখে পড়ে নি?

এইসব খবর আমি পড়ি না।

আমার পড়তে ইচ্ছা করে না, কিন্তু পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে পড়তে হয়।

এত দেরি হচ্ছে কেন?

একটু সময় লাগবে। নানান ফ্যাকড়া আছে। এরকমও হয়েছেডাক্তার চমৎকার রিপোর্ট দিয়েছেন, রিপোর্টের উপরই কনভিকশন হয়ে যাবে এমন অবস্থা, কিন্তু আমরা সে-সব রিপোর্ট কাজে লাগাতে পারি নি।

কেন?

বাদীপক্ষ কেইস উইথড্র করে। এগোতে চায় না। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়তো হবে। দেখলেন না, স্বামী বেচারার কোনো আগ্রহ নেই। এল না পর্যন্ত। আমি যখন যাব আমার সঙ্গে কথাও বলবে না।

পুষ্পকে আসতে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে বুড়োমতো এক জন ডাক্তার। রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। নুরুদ্দিন রিপোর্টে চোখ বোলালেন। নিশাত বলল, কী আছে রিপোর্টে?

নুরুদ্দিন জবাব দিলো না। রিপোর্টটা পকেটে রেখে দিলেন। ডাক্তার সাহেব নিশাকে বললেন, আমি কিছু সিডেটিভ প্রেসক্রাইব করেছি। সিডেটিভ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। প্রচণ্ড মানসিক চাপ গেছে। পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

নুরুদ্দিন বললেন, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার কিছু ইনফরমেশনও দরকার। ঐ সঙ্গে নিয়ে আসব।

গাড়িতে নিশাত আরেক বার বলল, রিপোর্ট কী পাওয়া গেছে? নুরুদ্দিন প্রশ্নের জবাব দিলেন না। অন্য একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর সম্ভবত এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করবার ইচ্ছা নেই। নিশাত আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

জহির এখন ফেরে নি।

নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধুব জুটিয়েছে। মাঝেমাঝে বন্ধুবান্ধব জুটে যায়। বাড়ি ফিরতে রাত হয়। তার চোখেমুখে অপ্রস্তুত ভাব লেগে থাকে। লজ্জিত-অনুতপ্ত মানুষের আচরণ দেখতে ভালো লাগে। নিশাতের মনে হল আজ তাই দেখবে।

সে রান্না চড়াল। সামান্য কিছু রান্না করবে—ভাত, দু পিস মাছ ভাজা, ডাল। ভাগ্যিস জহির তার বাবার মতো লোজনবিলাসী হয় নি। হলে মুশকিল হত। রান্নাঘরে সময় দিতে তার ভালো লাগে না।

রান্না শেষ করে নিশাত দ্বিতীয় বার স্নান করল। তবু নিজেকে ঠিক ফ্রেশ মনে হচ্ছে না। মনের কোথাও যেন খানিকটা কাদা লেগে আছে। এই কাদা কিছুতেই দূর হবে না। তার প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। এক বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে খেতে বসে গেল। রাত দশটার মতো বাজে। আর অপেক্ষা করার অর্থ হয় না। জহির নিশ্চয়ই খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফিরবে।

পুষ্প কিছু খেয়েছে কি না কে জানে। হয়ত খায় নি। খোঁজ নেওয়া উচিত। কিন্তু প্রচণ্ড আলসেমিতে শরীর কেমন করছে। মনে হচ্ছে কোনোমতে বিছানায় গড়িয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাবে। তা ছাড়া এরা স্বামী-স্ত্রী এখন কিছু সময় একা থাকুক। এর প্রয়োজন আছে।

ভাত শেষ না-করেই নিশাত উঠে পড়ল। খিদে আছে, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। অদ্ভুত শারীরিক অবস্থা!

জহির এল রাত এগারটায়। মুখে অনুতপ্ত মানুষের লাজুক হাসি। টাই খুলতে। খুলতে বলল, মহিউদ্দিনের পাল্লায় পড়েছিলাম। জোর করে ঢাকা ক্লাবে নিয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল

না। দু পেগ হুইস্কি খেতে হল। যত বলি লিকার আমার পছন্দ না, তত জোর করে। সব মাতালরা অন্যদের মাতাল বানানোর চেষ্টা করে। মনে করে এটা তাদের ডিউটি। ভাত খেয়েছ?

হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয়ই খেয়ে এসেছ?

হুঁ। কেমন বমি-বমি লাগছে। হুইস্কি আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন কৈফিয়ত দিচ্ছ আমার কাছে। কৈফিয়ত দেবার কিছু নেই। খেতে ইচ্ছা করলে তুমি খাবে। মাতাল হতে চাইলে হবে। তোমার জীবন হচ্ছে তোমার, আমারটা আমার।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, তার মানে?

মানে কিছু নেই।

মনে হচ্ছে তুমি খুব রেগে গেছ।

না, আমি মোটও রাগি নি। এর আগেও তুমি অনেক বার লিকার খেয়ে বাড়ি ফিরেছ। কখনো আমি কিছু বলি নি। বলেছি?

তা বল নি, কিন্তু মুখ অন্ধকার করেছ। মুখ অন্ধকার করার চেয়ে বলে ফেলা ভালো।

আজও কি আমার মুখ অন্ধকার মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ।

দুঃখিত। মুখ অন্ধকার করতে চাই নি। হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না। বিশ্রাম নাও।

জিনিসটা আমার সহ্য হয় না, মাতালের পাল্লায় পড়ে.....কড়া করে এক কাপ কফি করতে পারবে?

হ্যাঁ, পারব।

নিশাত রান্নাঘরে ঢুকল। কফি বানাল। টেবিলের উপর থেকে খাবারদাবার ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখল। জহির এসে উকি দিল রান্নাঘরে।

নিশাত, তোমার টেলিফোন। মোহাম্মদপুর থানা থেকে ইন্সপেক্টর নুরুদ্দিন তোমাকে চাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছু না।

ব্যাপার কিছু না মানে? দুপুর-রাতে থানা থেকে তোমাকে টেলিফোন করবে। কেন? হয়েছেটা কি?

বললাম তো কিছু হয় নি।

নিশাত টেলিফোন ধরল। ইন্সপেক্টর নুরুদ্দিন বললেন, সরি, অনেক রাতে টেলিফোন করলাম।

অসুবিধা নেই। আমি জেগেই ছিলাম।

আমরা মিজানকে এই কিছুক্ষণ আগে গ্রেফতার করেছি, এই খবরটা আপনাকে দিলাম। আপনি যদি এঁকে খবরটা দেন, উনি হয়তো খুশি হবেন।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আরেকটা কথা আপনি বারবার জানতে চাচ্ছিলেন যে, মেডিকেল রিপোর্টে কিছু পাওয়া গেছে কি না। কিছু পাওয়া যায় নি।

সে-কী।

এইসব ব্যাপারে সাধারণত ধস্তাধস্তি হয়। জখম থাকে ভিক্টিমের গায়ে। কামড়ের দাগ থাকে। সে-সব কিছুই নেই।

ও অজ্ঞান ছিল?

হ্যাঁ, তাই। আমি বুঝতে পারছি। আমাদের এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে। কোর্টকে বোঝাতে হবে। মুশকিল কি হচ্ছে জানেন, কোনোসিমেনও পাওয়া যায় নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তার কারণ বুঝতে পারছি। মেয়েটি নিশ্চয়ই বেশ কয়েক বার গোসল করেছে। এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাই করে। বিপদে পড়ি আমরা। চিহ্ন থাকে না।

কেইস দাঁড় করাতে পারবেন না?

আমার নাম নুরুদ্দিন-আমি খুব খারাপ লোক। আমি কেইস দাঁড় করিয়ে দেব। আপনারা খুব ভালো এক জন লইয়ার দেবেন। আচ্ছা রাখি।

নিশাত টেলিফোন রেখে দিল। জহির তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে থমথমে গলায় বলল, কি হয়েছে?

পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটি রেপ্‌ড্‌ হয়েছে।

তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তোমাকে টেলিফোন করেছে কেন?

আমি মেয়েটিকে পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়েছি।

তুমি নিয়ে গেছ। কেন? তুমি কেন? তোমার কিসের মাথাব্যথা?

নিশাত চুপ করে আছে। জবাব দিচ্ছে না। এক বার ছোট্ট একটা হাই তুলল। জহির বলল, কথা বলছ না কেন?

তুমি সুস্থ না। কাজেই কথা বলছি না।

আমি সুস্থ না?

না। তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না। যা মনে আসছে বলছ। এখন আমি তোমার কোনো কথার জবাব দেব না।

নিশাত শোবার আয়োজন করছে। ঝাড়ন দিয়ে বিছানা ঝাড়ছে। মশারি জলে। কড়া বাতি নিভিয়ে নীল বাতি জ্বালাল, যেন কিছুই হয় নি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার যেন কোন অস্তিত্ব নেই। নিশাত মশারির ভেতর থেকে বলল, এস, শুয়ে পড়। রাত কম হয় নি।

জহির হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ঘুমুতে এল। কোমল গলায় বলল, ঘুমিয়ে পড়েছ?

না, চেষ্টা করছি।

কিছু মনে করো না নিশাত। হঠাৎ মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। আই অ্যাম সরি।

আমি কিছু মনে করি নি।

জহির একটা হাত নিশাতের গায়ে তুলে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। নিশাত খুব সাবধানে হাতটা সরিয়ে দিল। স্পর্শ সবসময় সুখকর হয় না। নিশাতের ঘুম আসছে না। অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে খুব একা লাগছে।

সে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে খুব তারা। ঝলমল করছে। আকাশ। কত নক্ষত্র কত ছায়াপথ। সীমাহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজন মানুষের নিঃসঙ্গতাও কি সীমাহীন হয়?

৯. রকিব জেগে আছে

রকিব জেগে আছে। সে উবু হয়ে খাটের উপর বসে আছে। তার পাশেই পল্টু। মেঝেতে সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুষ্প শুয়ে আছে। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার। পুষ্প ঘুমিয়ে আছে কি না বুঝতে পারছে না। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। যেভাবে সারা গায়ে চাদর জড়িয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে।

পুষ্প। এই পুষ্প।

পুষ্প একটু নড়ল, কোনো রকম শব্দ করলো না। রাতে তাদের কারোরই খাওয়া হয় নি। রকিবের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে খাওয়ার কথা কী করে পুষ্পকে বলবে বুঝতে পারছে না। রাতে রান্না হয় নি। খাবারদাবার কিছু বাইরে থেকে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। রাত জাগলেই খিদে পায়।

পুষ্প। এই পুষ্প।

কি?

থানায় কী হল?

পুষ্প জবাব দিল না। চাদরে মুখ ঢেকে দিল। অত্যন্ত অবাক হয়ে রকিব লক্ষ করল, এই মুহূর্তে তার শুধু খিদের কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে। অন্য কিছু মনে আসছে না। সে মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পুষ্পের মাথার কাছে চেয়ারটায় খানিকক্ষণ বসে

রইল। ভোর হতে কত দেরি কে জানে। ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করছে না। তবে মনে হচ্ছে খুব দেরি নেই। ভোর হলে সে কী করবে? তার কী করা উচিত? এই বাড়িতে থাকা যাবে না। তার কেন জানি মনে হচ্ছে আশপাশের সবাই ব্যাপারটা জেনে গেছে। পুলিশ যাওয়া-আসা করেছে। জানাই তো উচিত। বাড়িওয়ালার ভাগ্নে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? সে শুকনো গলায় বলল, কিছু না।

পুলিশ কী জন্যে?

এই মামুলি ব্যাপার। কিছু জিনিসপত্র চুরি গেছে।

ছেলেটা এই কথা বিশ্বাস করল না। কীরকম অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল। সবই হচ্ছে কপালের খেলা। এত মেয়ে থাকতে সে কি না বিয়ে করল পরীর মতো একটা মেয়েকে কালো, নাক বোঁচা, বেঁটে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে কি আর এই সমস্যা হত? সুখে থাকত সে। মহা সুখে থাকত। কথায় আছে না, পয়লা নম্বরী সুন্দরীর সঙ্গে করতে হয় ফষ্টিনষ্টি, দু নম্বরী সুন্দরীর সঙ্গে করতে হয় প্রেম। বিয়ে করতে হয় তিন নম্বর সুন্দরীকে।

সে করেছে বিরাট আহাম্মুকি। সুন্দরী বিয়ে করেছে। সুন্দর ধুয়ে এখন কি সে পানি খাবে? দেখতে সুন্দর হলেই হল না, বুদ্ধিও থাকতে হয়। বুদ্ধি থাকলে কখনো এই কাণ্ড ঘটে? একটা চিৎকার দিলে পঞ্চাশটা মানুষ আসে। সাহায্যের জন্যে আসে না, মজা দেখার জন্যে আসে। তাতে তো অসুবিধার কিছু নেই। লোক তো জড়ো হয়।

এই কেলেঙ্কারির কথা নিশ্চয়ই পত্রিকায় উঠবে। পত্রিকাওয়ালারা এইসব জিনিসই খোঁজ। বক্স করে ছাপায়। এই খবরগুলি লোজন পড়েও আগে। কালকের খবরের কাগজ খুললেই

হয়তো দেখা যাবে, গৃহবধূ পুষ্প ধর্ষিতা। আত্মীয়স্বজনেরা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে। জনে-জনে চিঠি লিখতে হবে, বাদ সমাচার এই যে খবরের কাগজে যে সংবাদ ছাপা হইয়াছে ইহার সহিত আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। নাম ও জায়গা এক হওয়ায় কিছুটা বিভ্রাট সৃষ্টি হইয়াছে। আমি পড়িয়াছি যন্ত্রণায়। জনে-জনে পত্রপাঠ উত্তর দিবেন। শ্রেণীমতে সালাম ও দোয়া দিবেন। আরজ ইতি।

কিছুতেই ব্যাপারটা জানাজানি করতে দেওয়া যাবে না। কেইসের তো প্রশ্নই আসে না। পুষ্পকে বুঝিয়ে বলতে হবে। মাথা খারাপ করলে তো চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

রকিব শেষ সিগারেটটা ধরাল। পল্টু জেগে উঠেছে। রাতে এক বার উঠে দুধ খায়। এটা কি সেই ওঠা কি না কে জানে! পল্টু কাঁদতে শুরু করেছে। পুষ্প নড়ছে না। যেন। পল্টুর কান্নার শব্দ তার কানে যাচ্ছে না। রকিব বলল, এই পুষ্প, ওকে দেখ না! একটু দুধটুধ খাবে বোধহয়। পুষ্প উঠল, কিন্তু তার বাবুর কাছে গেল না। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাউমাউ শব্দে কাঁদতে শুরু করল। শব্দ যাতে বাইরে না আসে তার জন্যে দরজা বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু শব্দ আসছে। রকিব স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই প্রথম বারের মতো মনে হল, পুষ্পকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলার দরকার ছিল। সে বলে নি।

রকিব বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, এই পুষ্প, কী করছ? দরজা খোল। পুষ্প দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সহজ ভঙ্গিতে বাবুকে কোলে নিয়ে দুধ খেতে দিল। ছেলেটা এত বড় হয়েছে, এখনন মার দুধ খায়! রকিব নিচু গলায় বলল, কান্নাকাটি করে এখন

আর কী হবে। মানে..... সে তার কথা শেষ করল না। কারণ, কী বলবে বুঝতে পারল না।

পুষ্প থেমে-থেমে বলল, তুমি কি এখন আমাকে ঘেন্না করছ?

ঘেন্না করব কেন?

শরীরটা নোংরা হয়ে আছে এই জন্যে।

কী যে বল!

তুমি আমাকে ঘেন্না করছ। আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। এইসব বোঝা যায়।

বাথরুমের আলোর খানিকটা এসে পড়েছে পুষ্পের গায়ে। কী অদ্ভুত সুন্দরই না তাকে লাগছে। রকিব এগিয়ে এসে পুষ্পের পিঠে হাত রাখল। পুষ্প শান্ত স্বরে বলল, আমাদের বাসার পাশে একজন মোক্তার সাহেব থাকতেন। কতগুলি গুণ্ডা ছেলে তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে এক রাত একটা দোকানে আটকে রেখেছিল। তাঁর স্ত্রী পরদিন ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু মোক্তার সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ঘরে নেন নি। পরের বছর তিনি আরেকটা বিয়ে করেছিলেন।

রকিব বলল, আজেবাজে কথা বলার কোনো দরকার নেই। এস কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি। ভোরবেলায় আমরা এইখানে তালা দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। কল্যাণপুরে তোমার ভাইয়ের বাসায় কিংবা অন্য কোথাও।

কেন? কল্যাণপুরে যাব কেন?

এইখানে জানাজানি হয়ে গেছে। নানান জনে নানান কথা বলবে।

বলুক। আর জানাজানি তো হবেই। কোর্টে কেইস উঠবে না? তুমি কী ভাবছিলে? আমি মুখ বন্ধ করে বসে থাকব?

রকিব অবাক হয়ে লক্ষ করল, এই পুস্প দিনের বেলা ভেঙে পড়া পুষ্প নয়। অন্য পুষ্প, তাকে সে ঠিক চেনে না।

১০. নিশাত খুব ভোরবেলায় তার মার বাড়িতে

নিশাত খুব ভোরবেলায় তার মার বাড়িতে চলে এল। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাবাকে ধরা।

ফরহাদ সাহেব সকাল আটটার আগেই বাড়ি থেকে বের হন। রিটায়ার করার পর বিদেশি এক কোম্পানিতে কনসালটেন্সি করেন। ওদের অফিস শুরু হয় আটটায়।

গেট খুলে নিশাত অবাক হয়ে গেল। বারান্দায় তার বোন মীরু। ছবছর পর দেখা। এরা থাকে নিউজার্সিতে। দেশে যে বেড়াতে আসবে এরকম কোনো আভাস চিঠিপত্রে ছিল না।

নিশাত ছুটে এসে মীরুকে জড়িয়ে ধরল। মীরু বলল, দম বন্ধ করে মারবি নাকি? ছাড় তো!

না, ছাড়ব না।

নিশাত আনন্দে কেঁদে ফেলল। মীর হাসতে-হাসতে উচু গলায় বলল, এই, তোমারা সবাই এসে দেখে যাও নিশাত কেমন ভ্যাভ্যা করে কাঁদছে। এই মেয়েটা দেখি বড় হল না! মীরুর নিজের চোখ ভিজে গেল। কত দিন পর দেখছে নিশাতকে। খুব সখ ছিল ওদের বিয়ের সময় থাকবে। আসা হয় নি।

মীরুর স্বামী ইয়াকুব বেরিয়ে এসেছে। সে হাসিমুখে বলল, নিশাত, এবার তোমার দুলাভাইকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ কাঁদ। তাকেও তো তুমি অনেক দিন পর দেখছ।

আপনারা কখন এসেছেন দুলাভাই?

ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে পৌছলাম রাত দটায়। বেরুতে-বেরুতে সাড়ে তিন। সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে কাউকে কোনো খবর দেওয়া হয় নি। কাজেই এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার কোনো ট্রান্সপোর্ট নেই। মহা যন্ত্রণা! তোমরা দুবোন পরস্পরের দুঃখের আলাপ কিছু করে নাও। তারপর আমি কথা বলব। এক কাজ কর, একটা ঘরে ঢুকে যাওবাইরে থেকে আমি দরজা বন্ধ করে দি।

নিশাত বলল, বাচ্চারা কোথায়?

ওদের আনি নি। স্কুল খোলা। বাংলাদেশের স্কুল তো না, যে অ্যাবসেন্ট করা যাবে।

ক দিন থাকবে?

গুনে গুনে দশ দিন। আজকের দিন চলে গেলে থাকবে ন দিন। কাজেই তুই তোর বরকে নিয়ে চলে আয়। এই দশ দিন একসঙ্গে থাকব। তোর বরটা কেমন?

ভালো।

শুকনো মুখে ভালো বলছিস কেন, জোর করে বল। মা বলছিলেন, একটু নাকি গম্ভীর টাইপের, অমিশুক। শ্বশুরবাড়িতে বিশেষ আসেটাসে না।

নিশাত জবাব দিল না। তার একটু মন-খারাপ হল। মা জহিরকে তেমন পছন্দ করেন না। করতেই যে হবে তেমন কথা নেই, কিন্তু যার সঙ্গে দেখা হয় তার সঙ্গেই প্রথমে নিজের

অপছন্দের কথাটা বলেন। মীরু আপাকে আসতে-না-আসতেই বলেছেন। দু-একটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না।

নিশাত, তোর বরকে ইয়াকুবের সঙ্গে জুড়ে দেব, দেখবি সাত দিন তাকে সামাজিক বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

সব জামাই কি আর এক রকম হয় আপাং মার বড় দুলাভাইকে মনে ধরেছে, আর কাউকে তাঁর পছন্দ হবে না।

তোর নিজের কি হোর বরকে পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে।

গুড। আর কারো পছন্দ হোক না-থোক তাতে কিছু যায়-আসে না। দাঁড়া তোর দুলাভাইকে পাঠিয়ে দিই, জহিরকে নিয়ে আসবে।

কাউকে পাঠাতে হবে না, খবর দিলে নিজেই চলে আসবে।

না, ও গিয়ে নিয়ে আসবে। তোর জন্যে চমৎকার গিফট এনেছি। তোর দুলাভাই পছন্দ করে কিনেছে। বিয়ে উপলক্ষে গিফট। আন্দাজ কর তো কী?

আন্দাজ করতে পারছি না।

দাঁড়া, এখানে আমি নিয়ে আসছি। তার আগে আমার গালে একটা চুমু খা তো।

নিশাত মীরুর গালে চুমু খেল। আবার তার চোখে পানি এসে গেল। মীরু বলল, তোর পাশের ফ্ল্যাটের একটা মেয়ে নাকি রেড় হয়েছে? তুই খুব ছোটাছুটি করছিস?

কে বলেছে?

না, মার কাছে শুনলাম। তুই সাবধানে থাকবি। কেমন ফ্ল্যাট তোদর? ভালো প্রিকশন নেই। ঐ ফ্ল্যাট তুই ছেড়ে দে। অসম্ভব, ওখানে তোক যেতেই দেব না।

নিশাত মুগ্ধ হয়ে মীরুকে দেখছে। কেমন হড়বড় করে কথা বলছে। কী সুন্দর লাগছে আপাকে। গিফট দেখাবার কথা বলেছে, এখন আর তা তার মনে নেই।

নিশাত রান্নাঘরে উঁকি দিল। মা খুব ব্যস্ত। রাজ্যের রান্না মনে হচ্ছে এক দিনে বেঁধে ফেলবেন। তাঁর মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। তিনি এক বার শুধু নিশাতের দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এত আয়োজন কি শুধু সকালের নাশতার মা?

হ্যাঁ, তুই জহিরকে আনবার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দে।

গাড়ি পাঠাতে হবে না, আমি টেলিফোন করছি, চলে আসবে।

নিশাত তার বাবার খোঁজে গেল। তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। নিশাত জহিরকে টেলিফোন করল।

হ্যালো, তুমি এখানে চলে এস।

কেন বল তো!

আপা আর দুলাভাই এসেছেন আমেরিকা থেকে।

তাই নাকি? হ্যাঁ, সারপ্রাইজড ভিজিট। তুমি চলে এস। অফিসে যেতে হলে এখান থেকে যাবে।

আসছি। নিশাত শোন, ঐ মেয়েটি, মানে পুষ্প, বেশ কয়েক বার এসে তোমার খোঁজ করে গেছে।

কিছু বলেছে?

না, বলে নি।

তুমি কি আসবার সময় জিজ্ঞেস করে আসবে কী ব্যাপার?

জহির কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে। না। তুমি ইনভলব্ড্ হয়েছ এই যথেষ্ট। পুরো পরিবারসুদ্ধ ইনভলব্ড্ হবার কোন কারণ দেখি না।

ইনভলব্ড্ হবার তো কথা হচ্ছে না। তুমি শুধু জিজ্ঞেস করবে কী ব্যাপার?

এর মধ্যে যদি এখানে আসে তা হলে জিজ্ঞেস করব। আমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারব না।

আচ্ছা, তাই করো।

১১. রকিব তিন দিন অফিসে এসেছে

রকিব তিন দিন পর আজ প্রথম তার অফিসে এসেছে। চুপচাপ তার চেয়ারে বসে আছে। টেবিলের ফাইলপত্র খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল। তার মনে হচ্ছে সবাই তাকে অন্য রকম দৃষ্টিতে দেখছে। এখন পর্যন্ত কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে নি গত তিন দিন সে আসে নি কেন। অথচ এটা জিজ্ঞেস করা খুবই স্বাভাবিক।

পাশের টেবিলে বসে আজিজ খাঁ। তার বিশেষ বন্ধু। সেও এখন পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞেস। করছে না। রকিব নিজ থেকেই বলল, জ্বরে পড়ে গিয়েছিলাম। গোসল করে ফ্যানের নিচে শুয়েছি, ফট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। সকালেও জ্বর ছিল।

আজিজ খাঁ তবু কিছু বলল না। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অথচ তার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কোন কারণ নেই। তার সমস্যার কথা এরা নিশ্চয়ই কিছু জানে না। কোনো পত্রিকায় কিছু ছাপা হয় নি। সব কটা পত্রিকা সে খুটিয়ে-খুটিয়ে পড়েছে। তা হলে সবাই এরকম করছে কেন? নাকি সবটাই তার মনের ভুল?

টিফিনের সময় এ. জি. এম. মনসুরউদ্দিন সাহেব তাকে ডেকে পাঠালেন। মনসুরউদ্দিন সাহেব ধমক না-দিয়ে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন না, এবং কাউকে বসতে বলেন না। কেউ যদি বসে পড়ে তিনি সরু চোখে তাকান। অথচ আজ তিনি রকিবকে ঘরে ঢোকামাত্র বসতে বললেন।

রকিব সাহেব চা খাবেন?

জ্বি-না স্যার।

কাল তিনটার দিকে আপনাকে এক বার খোঁজ করেছিলাম।

কাল আসি নি স্যার জ্বর ছিল। গোসল করে ফ্যানের নিচে শুয়েছিলাম, বুকে ঠাণ্ডা বসে গেছে।

ও আচ্ছা!

কী ব্যাপার স্যার?

না, মানে অফিসিয়াল কিছু না। এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনার খোঁজে। আমার পরিচিত আর কি। ওনার কাছে শুনলাম।

রকিবের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

রকিব সাহেব, আপনি কি কোনো পুলিশ কেইস করেছেন নাকি?

রকিব হ্যাঁ, না কিছু বলল না।

ভদ্রলোক ঐ ব্যাপারেই কথা বলতে এসছিলেন। মানে কোনো সেটেলমেন্টে আসা যায় কি না। অবশ্যি আপনিই ভালো বুঝবেন। আগে বলুন তো হয়েছেটা কি?

কিছু হয় নি স্যার।

ঐ ভদ্রলোকও তাই বলছিলেন। আমি ওনাকে আপনার বাসার ঠিকানা দিয়েছি। উনি ঠিক বাসায় যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নন।

উনি কে স্যার?

মিজান সাহেবের মামা হন সম্পর্কে। চৌধুরী খালেকুজ্জামান। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আপনি বরং টেলিফোনে ওনার সাথে কথা বলুন। আমার কাছে একটা কার্ড আছে। এই নিন।

রকিব হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল। মনসুরউদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, এই জন্যেই ডেকেছিলাম, অন্য কিছু না। আপনি খালেকুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলুন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কোনো রকম সঙ্কোচ ছাড়া কথা বলবেন। খোলাখুলি কথা হওয়া ভালো। কি বলেন?

জি স্যার।

আমি বরং ওনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিই। আজ সন্ধ্যাবেলা বাসায় চলে যান। ব্যস্ত মানুষ তো. অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা হওয়া মুশকিল। তা হলে কি

করব অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

রকিব এমন ভাবে মাথা নাড়াল যার মানে হ্যা বা না দুই-ই হতে পারে। সে অফিসে চারটা পর্যন্ত বসে রইল। বিভিন্ন ফাইল খুলল এবং বন্ধ করল। চারটার পর সে বাসায় গেল না। পার্কের বেঞ্চিতে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত বসে রইল। পার্কের কাছেই খালেকুজ্জামান সাহেবের বাসা। হেঁটে হেঁটেই যাওয়া যায়। রকিবের একবার মনে হচ্ছে তার যাওয়া উচিত,

ভদ্রলোক কি বলেন শোনা উচিত। আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, কেন সে যাবে? তার কিসের গরজ?

রাত আটটা পর্যন্ত সে পার্কে বসে রইল। আটটার পর খালেকুজ্জামান সাহেবের বাসার সামনে উপস্থিত হল। বিশাল বাড়ি। গেট বন্ধ। খাকি পোশাক পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। রকিব নিচু গলায় বলল, চৌধুরী সাহেব কি বাড়ি আছেন?

জ্বি আছেন। দেখা করবেন?

না, দেখা করব না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

দারোয়ানের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে রকিব লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাসার দিকে রওনা হল। রাস্তায় বাতি নেই। হাঁটতে কেমন গা ছমছম করে। লোকজনের চলাচলও খুব কম। ঢাকা শহর বদলে যাচ্ছে। রাত নটার পর রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

আকাশে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামলে খুব ঝামেলায় পড়তে হবে। ভিজতে-ভিজতে বাড়ি ফেরা। ঠাণ্ডা লেগে গেলে সর্বনাশ।

বড় রাস্তায় ওঠার আগেই বৃষ্টির ফোঁটা দু-একটা পড়তে শুরু করল। কিছু-কিছু রিকশা আছে, তারা কোথাও যাবে না। যাবে না তো রিকশা নিয়ে বসে আছে কেন কে জানে। রকিব চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসল। বৃষ্টি চেপে নেমেছে। ধরার কোনো লক্ষণ নেই। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে কাকভেজা হয়ে। তার কপালটাই খারাপ। অফিস থেকে সরাসরি বাসায় চলে এলে এই ঝামেলা হত না।

বাসায় ফিরতে-ফিরতে রকিবের এগারটা বেজে গেল। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়েছে। গলা বসে গেছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে প্রবল জ্বর আসছে। ঠাণ্ডা তার সহ্য হয় না। তার জীবনটা এমন কেন? যে-সব সহ্য হয় না বারবার সেসবের মধ্যে দিয়েই তাকে যেতে হয়।

সে না হয়ে অন্য কেউ হলে একটা রিকশা পেয়ে যেত। সে বলেই পেল না। হেঁটে হেঁটে কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে এতটা পথ আসতে হল।

বাসা ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে। পুরো অঞ্চলে ইলেকট্রিসিটি নেই। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পুষ্প বসে আছে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে। কেন জানি মনে হচ্ছিল মিজান ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়েই চলে এসেছে এখানে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে হাসি-হাসি গলায় বলবে, ভাবি চিনতে পারছেন তো, অধমের নাম মিজান। রকিব যখন দরজায় ধাক্কা দিল, উঁচু গলায় বলল, দরজা খোল—তখনন তার পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি এটা রকিব। পুষ্প ভয়ে কাতর গলায় বলেছে, কে, কে? পল্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল। পল্টুকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। যেন এই শিশুটিও মায়ের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে।

দরজা খোল না। এই পুষ্প।

পুষ্প দরজা খুলল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, কোথায় ছিলে তুমি? ইস, কি অবস্থা হয়েছে। এরকম করে ভিজলে কেন?

রকিব জবাব দিল না। বাথরুমে ঢুকে গেল। পুষ্প বলল, ভয়ে আমি মরে যাচ্ছিলাম। নিশাত আপারাও নেই সন্ধ্যা থেকে। বাসায় ইলেকট্রিসিটি নেই। তুমি কথা বলছ না কেন? ভাত গরম করব?

রকিব সেই প্রশ্নের উত্তর দিল না।

এ্যাই, কথা বলছ না কেন?

ভালো লাগছে না তাই বলছি না। এসেই প্রেমালাপ শুরু করব নাকি? অবস্থাটা দেখছ না!

ভাত বাড়ব?

না, পানি গরম কর। গোসল করব।

পুষ্প গরম পানি এনে দিল একটামাত্র মোমবাতি, তাও শেষের দিকে চলে এসেছে। শেষ হলেই অন্ধকারে ঘর ঢেকে যাবে। প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। শক্ত বাতাসও দিচ্ছে। আজ সারা রাত নিশ্চয়ই কারেন্ট আসবে না।

আজ সকালবেলা নিশাত আপা এসেছিলেন। ওনার বোন আর দুলাভাই এসেছেন এই জন্যে তাঁরা কদিন ঐ বাড়িতে থাকবেন। কীরকম ভয়ের ব্যাপার না?

ভয়ের কী আছে এর মধ্যে?

এত বড় বাড়িতে আমরা একা। বাড়িওয়ালা তো নেই, শুধু তার ভাগ্নেটা আছে। ওকে দিয়েই মোমবাতি আনালাম।

ভালো করেছ।

গোসল শেষ হতে হতে মোমবাতি ফুরিয়ে গেল। রকিব বিরক্ত মুখে বলল, আর নেই মোমবাতি?

না।

একেকটা কাজ যা কর না! দুটো মোম আনতে কি অসুবিধা ছিল?

পুষ্প ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। এখন চুপ করে থাকাই ভালো। রকিব কোনো কারণে রেগে আছে। অফিসে কিছু হয়েছে বোধহয়। অফিসে কিছু হলেই সে কয়েক দিন রেগে থাকে। কথা বললেই রেগে যায়।

পুষ্প ভাত খেল না। অন্ধকারে খাবে কীভাবে? সে অনেক দিন পর রকিবের পাশে নিজের বালিশ রাখল। এই কদিন তাদের দুজনের মাঝখানে বাবু ঘুমিয়েছে।

নিশাত আপা বাবুর জন্যে খুব দামি একটা প্যান্ট আর শার্ট এনেছেন। দেখবে?

অন্ধকারে দেখব কীভাবে? আমি বিড়াল নাকি?

পুষ্প লক্ষ করল রকিবের গলা তরল হয়ে আসছে। সেই রাগীরাগী ভাবটা এখন নেই।

তোমার গলার ব্যথাটা কমেছে?

না, এই ঘোড়ার ডিম আর কমবে না।

মাথা টিপে দেব?

ব্যথা করছে গলা, মাথা টিপে দিলে কী হবে?

পুষ্প হেসে ফেলল। এই তো মানুষটা সহজ হয়ে গেছে।

চা করে দেব? চা খাবে টোস্ট বিসকিট দিয়ে। রাতে কিছু খেলে না তো! খিদে লাগছে না?

লাগছে।

দেব করে?

দাও, বরং চারটা ভাতই দাও। অন্ধকারে খাব কী করে?

পুষ্প উঠে বসল। একটা হাত রাখল রকিবের গায়ে। তার মনে কিছু কথা জমে আছে, বলবে-বলবে করেও বলা হয় নি। এই অন্ধকারে বলে ফেললে কেমন হয়। আঁধার সেই কথাগুলি বলবার জন্যে বিশেষ একটা পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে।

এই শোন, একটা কথা বলি?

বল।

ঐ ঘটনার পর থেকে তুমি এক দিনও আমাকে আদর কর নি। আচ্ছা, আমাকে তোমার এখন ঘেন্না লাগে? না বল, আমি মন-খারাপ করব না। এখন কি আর আমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না?

রোজই তো ঘুমাচ্ছি।

এই ঘুমের কথা বলছি না। আমাকে তোমার এখন ঘেন্না লাগে?

আরে কী যে বল। মনমেজাজ ঠিক নেই। মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। এখন কি এসব ভাল লাগে? ইচ্ছা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে।

পুষ্প অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বৃষ্টির বেগ আগের মতোই আছে। ঢাকা শহর মনে হচ্ছে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পুষ্প অস্পষ্টভাবে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আজ আমাকে একটু আদর করবে?

অসুখবিসুখের মধ্যে এইসব যন্ত্রণা ভালো লাগে? বলেই রকিব স্ত্রীকে টেনে নিল। গভীর আনন্দে পুষ্পের চোখে পানি এসে গেছে। তার মনে হচ্ছে পাশের মানুষটি ছাড়া পুষ্প আর কাউকে চেনে না। আর কেউ তার নেই। এই মানুষটি একটি কড়া কথা বললে সে ছাদ থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে। এই মানুষটি.....

পুষ্প আর ভাবতে পারছে না। জগৎ-সংসার দুলে উঠতে শুরু করেছে। কী অপূর্ব, কী রহস্যময় স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাবাসির এই গোপন সম্পর্ক।

পুষ্প।

উঁ।

আমরা সুখেই আছি, তাই না?

আমার একটা কথা শুনবে পুষ্প?

কী কথা?

বলছি। কিন্তু বল, তুমি শুনবে?

হ্যাঁ।

রকিব পুষ্পকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এল। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, তোমার ব্যাপারটা জানাজানি হোক এটা আমি চাই না পুষ্প। জানাজানি হলে কী হবে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ।

কী হবে?

খবরের কাগজে উঠবে। সবাই কেমন করে আমাদের দিকে তাকাবে। পল্টু বড় হয়ে জানবে। আত্মীয়স্বজনরা কানাকানি করবে।

লোকটার শাস্তি হোক তুমি চাও না?

চাইব না কেন? অবশ্যই চাই। হারামজাদাকে আমি গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করার।

পুষ্প হাসল। অন্ধকারে সেই হাসি রকিব দেখতে পেল না।

তোমাকে কথা দিচ্ছি পুষ্প। প্রফেশন্যাল লোক লাগিয়ে কুত্তার বাচ্চাটার ভুঁড়ি নামিয়ে ফেলব।

পুষ্প শান্ত গলায় বলল, আমি কী চাই জান? আমি চাই সবাই শয়তানটাকে দেখুক। সবার সামনে শয়তানটার কঠিন শাস্তি হোক, তারপর আমরা কোনট-এ। অচেনা জায়গায় চলে যাব। সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। কেউ কিছু জানবে না। আমরা নিজেরা-নিজেরা থাকব।

অচেনা জায়গায় চাকরিটা আমাকে দেবে কে?

নিশাত আপা জোগাড় করে দেবেন। আমাকে বলেছেন। উনি সব ভেবে রেখেছেন। তিনি কী বলেছেন বলব?

রকিব জবাব দিল না। পুষ্প আগ্রহ নিয়ে বলতে লাগল, নিশাত আপা বলেছেন তোমার জন্যে সিলেট চা-বাগানে একটা চাকরির ব্যবস্থা করবেন। নিশাত আপার শ্বশুর একটা চা-

বাগানের মালিক। এখানে তুমি যা বেতন পাও, সেখানেও তাই পাবে। কি, কথা বলছ না কেন?

তোমার নিশাত আপার এত দরদ কেন?

মানুষের জন্যে মানুষের দরদ থাকবে না? পৃথিবীর সব মানুষই কি তোমার বন্ধুর মতো?

ঐসব হচ্ছে মুখের কথা। চা-বাগানে চাকরি জোগাড় করবে? চাকরি এত। সোজা?

নিশাত আপা করবে।

আর করলেইবা সেই চাকরি আমি নেব কেন? দয়া-দেখানো চাকরি। ঐসবের কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

ভবিষ্যৎ নাই-বা থাকল। নিরিবিলি একটা জায়গায় না হয় নতুন করে জীবন শুরু করলাম।

পুষ্প গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, রকিব কিছু বলছে না।

বৃষ্টির জোর কমে আসছে। জানালা গলে হিম-শীতল বাতাস ঢুকছে। মশারি নৌকার পালের মত ফুলে-ফুলে উঠছে।

পল্টু জেগে উঠেছে। অন্ধকার দেখে কাঁদছে। পুষ্প কিছু বলছে না। যেন তার ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছে না।

১২. কোনো কারণে জহির রেগে আছে

নিশাতের মনে হল আজ কোনো কারণে জহির রেগে আছে। জহির খুব সহজে রাগ আড়াল করে রাখতে পারে। প্রচণ্ড রাগ নিয়েও সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে। বিয়ের প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে নি। এখন পারে। চেহারা দেখে বলে দিতে পারে জহির রেগে আছে কি রেগে নেই।

এখন যেমন পারছে। তবে রাগের কোনো কারণ নিশাত ধরতে পারছে না। গত কাল অনেক রাত পর্যন্ত তারা ও-বাড়িতে ছিল। জহির খুব আগ্রহ নিয়ে দুলাভাইয়ের সঙ্গে গল্প করেছে। দুলাভাইয়ের অতি তুচ্ছ রসিকতাতেও খুব শব্দ করে হেসেছে। জহিরের জন্যে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। তবে বোঝা গেছে সে খুব আনন্দে আছে। আজ এই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কী হল? অফিসে কোন গণ্ডগোল হয়েছে? অফিসের গণ্ডগোলে বিচলিত হবার লোক তো জহির নয়।

নিশাত নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। স্বামীকে লক্ষ করতে লাগল দূর থেকে। জহির অফিসের কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় চা খেতে এল। এটা তার রুটিন। পরপর দু কাপ চা নিঃশব্দে খাবে। কোনো রকম কথা বলবে না। চোখের সামনে থাকবে খবরের কাগজ কিংবা কোনো গল্পের বই। আজ রুটিনের ব্যতিক্রম হল। জহির চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বলল, বাবার চিঠি পেলাম। আগামাথা কিছু বুঝতে পারছি না। নিশাত, তুমি একটু পড়ে দেখবে?

নিশাত বলল, যে-চিঠির আগামাথা তুমি বোঝ নি, আমি কী করে বুঝব? আমার কি এত বুদ্ধি?

বাবা লিখেছেন, তুমি নাকি তাঁর কাছে একটা চাকরি চেয়েছ। চা-বাগানের চাকরি।

আমার নিজের জন্যে না, অন্যের জন্যে।

কার জন্যে জানতে পারি?

পার। পুষ্পের স্বামীর জন্যে। ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে ও বেচারা থাকতে পারবে। না। নিরিবিলি কোন জায়গায় তাদের চলে যেতে হবে।

জহির কথা বলছে না। চায়ের কাপেও চমক দিচ্ছে না। সে রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে কি না কে জানে। নিশাত বলল, তোমার চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জহির চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে কাপ সরিয়ে রাখল। নিচু গলায় বলল, তোমার কি মনে হয় না, তুমি সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছ?

না, তা মনে হয় না।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে।

মনে হলে কিছু করার নেই।

ব্যাপারটা তুমি কি ভুলে যেতে পার না? অনেক কিছু তো করলে, আর কেন?

আমি কিছুই করি নি। চিঠিটা পড়ে দেখি।

আমার কোটের পকেটে আছে।

নিশাত উঠে চিঠির খোঁজে ভেতরে গেল। চিঠি নিয়ে এসে আবার বসল জহিরের – সামনে। মানুষটা কী কঠিন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে খাম খুলল।

নিশাত ভেবে পাচ্ছে না তার চিঠির উত্তরে উনি জহিরকে কেন লিখবেন। চাকরি কি দিতে পারবেন না? এই কথা সরাসরি জানাতে সঙ্কোচ করছেন?

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে নিশাতের সম্পর্ক খুব ভালো নয়। ওদের সবই যেন কেমন আলগা-আলগা। নিশাতের শ্বশুর ইসমাইল সাহেব দশ মিনিট কখনন কারো সঙ্গে কথা বলেন না। নিশাতের সঙ্গে কথাবার্তা হ্যা-র মধ্যে রেখেছেন। তবে জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, নববর্ষ— এইসব উপলক্ষে লোক মারফত একটা বড় প্যাকেট এসে। উপস্থিত হয়। সঙ্গে ইংরেজিতে একটা নোটার সারমর্ম, এই আনন্দ তোমার জীবনে অক্ষয় হোক।

জহিরের কাছের চিঠিটিও ইংরেজিতে লেখা। টাইপ করে পাঠিয়েছেন। এই চিঠিরও নিশ্চয়ই কয়েকটি কপি আছে, ফাইল কপি, অফিস কপি। নিশাত চিঠি পড়ল–

প্রিয় জহির,

নিশাত সম্প্রতি আমার কাছে চা-বাগানের একটি চাকরি চেয়ে চিঠি দিয়েছে। চাকরি কার জন্যে এবং সেই চাকরিপ্রার্থীর অভিজ্ঞতা কী তা লেখে নি। আমি নিজে যাচাই না করে কাউকে চাকরি দিই না। তবে নিশাতের জন্যে একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তোমার স্ত্রীকে আমি খুব পছন্দ করি। তার অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব। তোমাকে এই চিঠি লেখার কারণ হচ্ছে তুমি আমাকে চাকরিপ্রাথী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেবে। সে যেন চা-বাগানে চাকরি চেয়ে একটি দরখাস্ত করে। দরখাস্ত অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হতে হবে। তোমার কাছ থেকে চিঠি। পাবার পর আমি নিশাতকে চিঠি দেব।

ইতি
মোহাম্মদ ইসমাইল।

কাজের চিঠি। তুমি কেমন আছ জাতীয় একটা বাক্য পর্যন্ত নেই। যেন চিঠিটা কোনো মানুষের লেখা নয়, যন্ত্রের লেখা। নিশাত তাকাল জহিরের দিকে। রাগের কঠিন ভঙ্গিগুলি এখন আর জহিরের চেহারায় নেই। সে নিজেকে সামলে ফেলেছে। এখন সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে কথা বলবে, যেন দু জনের মধ্যে কখনো কিছু হয় নি।

জহির খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে হাসিমুখে বলল, চিঠি পড়লে?

হ্যাঁ।

পরে এই চিঠির ব্যাপার নিয়ে আলাপ করব। এখন বল তোমার প্রোগ্রাম কি?

আমার প্রোগ্রাম দিয়ে কী করবে?

তোমার দুলাভাই সবাইকে নিয়ে বড় কোন জায়গায় খেতে চান। নির্ভর করছে। তোমার প্রোগ্রামের উপর। যা ব্যস্ত তুমি। আজ সন্ধ্যায় সময় হবে?

হবে।

ভালো। তোমার দুলাভাই মানুষটি খুব চমৎকার। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

আর আমার বোন?

তিনি তোমার মতোই।

আমার মতো বলতে কী মিন করছ? আমি মন্দ না ভালো।

কখনো-কখনো ভালো। কখনো মন্দ।

উদাহরণ দাও। আমি কখন ভালো কখন মন্দ।

কারো সাতে-পাঁচে থাক না। নিজের মতো জীবন যাপন কর। এটা খুব ভালো। আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বাইরের জিনিস নিয়ে মাতামাতি কর, এটা মন্দ।

পুষ্পের ব্যাপারটার কথা বলছ?

হ্যাঁ।

এই ঝামেলা এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কেইস। খুব দ্রুত হয়। পুলিশ আজকালের মধ্যে চার্জশিট দিয়ে দেবে। বাকি রইল শুধু এক জন। ভালো উকিল।

পাও নি এখনো?

পেয়েছি, আজ কথা হবে।

জহির মুখ নিচু করে হাসছে। নিশাত বলল, হাসছ কেন? হাসির কী বললাম?

তোমার দুলাভাই বলছিলেন, তোমার কিছু করবার নেই, তাই বাইরের যন্ত্রণা নিয়ে মাতামাতি করছ। তোমার দু-একটা ছেলেপুলে থাকলে এটা করতে না। আমাকে

এই লাইনে কিছু সৎ পরামর্শ দিলেন।

পরামর্শ তোমার মনে ধরেছে?

হ্যাঁ। চল একটা বাচ্চাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসি।

নিশাত বাইরের দিকে তাকাল। কী চমৎকার একটা কথা বলেছে—একটা বাচ্চাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসি। একমাত্র বাবা এবং মা এই দুজনে মিলেই অদৃশ্য, অচেনা, রহস্যময় জগৎ থেকে একটা শিশুকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।

কী ব্যাপার নিশাত, এরকম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ কেন? তোমার মত নেই?

নিশাত কোমল স্বরে বলল, আমার মত আছে।

বলেই তার কেমন যেন লজ্জা লাগল। চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। লজ্জা ঢাকার জন্যে উঠে বারান্দায় চলে গেল। খুব ইচ্ছা করছে পুষ্পের বাচ্চাকে ধরে এনে কিছুক্ষণ আদর করতে। সময় নেই। উকিলের খোঁজে যেতে হবে। সরদার এ. করিম। ক্রিমিন্যাল আইনের ওস্তাদ লোক। তার হাতে এক বার ব্যাপারটা তুলে দিতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়।

নিশাত!

কি?

তোমার গোলাপের উবগুলির অবস্থা দেখছ? সবগুলি গাছে পোকা ধরেছে। গত সপ্তাহে তুমি ইনসেকটিসাইড দাও নি, তাই না?

ভুলে গিয়েছিলাম।

তাই দেখছি। জগৎ-সংসার ভুলে যেতে বসেছ। কয়েক দিন পর দেখা যাবে আমার কথাও তোমার মনে নেই।

নিশাত কিছু বলল না। গোলাপগাছগুলির অবস্থা সত্যিই কাহিল। পানিও দেওয়া হয় না। টব শুকিয়ে খটখট করছে। সত্যি খুব অন্যায় হয়েছে। তৃষ্ণায় এদের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, অথচ পানির কথা কাউকে বলতে পারে না। নিশাত গাছগুলিতে পানি দিল। ওষুধ স্প্রে করে দিল। এই ওষুধটা দেওয়ার সময় কেন জানি তার গা কাঁপে। কঠিন বিষ। অথচ

কী সুন্দর সোনালি রঙ। ইচ্ছা করে পরিষ্কার ঝকঝকে একটা গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে শেষ করে দিতে।

নিশাত।

বল।

চল রওনা হওয়া যাক।

ডিনারের দাওয়াত, এত তাড়া কিসের।

একটু সকাল-সকালই যাওয়া যাক। গল্পগুজব করে ধীরেসুস্থে আবার রওনা হব।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় নিশাত শুনল পুষ্প কাঁদছে। বেশ শব্দ করেই কাঁদছে। নিশাতের ব্যাপারটা ভালো লাগল না। কান্না হচ্ছে একটি খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এমনভাবে কাঁদা উচিত নয় যে অন্য কেউ তা টের পেয়ে ফেলে। কে যেন বলেছিল কথাটি-তুমি যখন হাস তখন দেখবে অনেকেই তোমার সঙ্গে হাসছে, কিন্তু তুমি যখন কাঁদ তখন দেখবে কেউ তোমার সঙ্গে কাঁদছে না। এটা কার কথা? রামকৃষ্ণ পরমহংস, নাকি কবিরের দোঁহা?

১৩. বিখ্যাত লোকদেরই কি চেহারা খারাপ

সব বিখ্যাত লোকদেরই কি চেহারা খারাপ থাকে? সরদার এ. করিমকে দেখে নিশাতের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একজন নিতান্তই বেঁটে মানুষ, কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছে। চোখ দুটি ব্যাঙের চোখের মতো অনেকখানি বের হয়ে এসেছে। চোখের মণি কটা। সবচেয়ে কুৎসিত দৃশ্য হচ্ছে নাকের ভেতরে বড়-বড় লোম বের হয়ে আছে।

উকিলদের গলার স্বর ভরাট হবার কথা। কথা বললেই কোর্ট-রুমের সবাই যেন শুনতে পারে। এঁর গলা মোটেই সেরকম নয়। মেয়েদের মতো চিকন গলা। তবে উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আপনি ফরহাদ সাহেবের মেয়ে?

জ্বি।

আপনার বাবা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন।

আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনি আমার বাবার বয়সী।

বাবার বয়সী সবলোকই কি আপনাকে তুমি করে বলে?

জ্বি-না।

তা হলে আমি বলব কেন? আচ্ছা শুনুন, কাজের কথায় আসি। আমি তো রেপ কেইস করি না। তবু কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখেছি নিতান্তই ভদ্রতার কারণে। শুধু শুধু সময় নষ্ট।

রেপ কেইস কেন করেন না জানতে পারি?

সত্যি-সত্যি জানতে চান?

চাই।

রেপ কেইসে জেতা যায় না। ভরাডুবি হয়। আর আপনার এই কেইসের কোনো আশা দেখছি না। মেডিকেল রিপোর্টে কিছু নেই। কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। আসামী হচ্ছে মেয়ের স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মেয়ের স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কি রেপ করে না?

করবে না কেন, করে। তবে অধিকাংশ সময়েই ব্যাপারটা হয় আপোসে।

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

কোর্টে গেলেই আপনি বুঝবেন আমি কী বলছি। এই মামলা তৃতীয় দিনের হিয়ারিং-এর পরই ডিসমিস হয়ে যাবে। একজন সার্জন যখন জানেন অপারেশন টেবিলেই রুগী মারা যাবে, তখন তাঁরা অপারেশন করেন না।

এমন সার্জনও আছেন যাঁরা রুগী মারা যাবে জেনেও অপারেশন করেন। সাধ্যমত চেষ্টা করেন রুগীকে বাঁচাতে।

আমি সেরকম কেউ না। আমার মধ্যে বড়-বড় আদর্শ নেই। তা ছাড়া আমি রেপ ব্যাপারটাকে খুব বড় করে দেখি না।

তার মানে।

এটা বেশ ক্ষুদ্র ব্যাপার মনে করি। একটা লোককে মারধর করে আপনি তার একটা হাত ভেঙে ফেললেন, এতে আপনার শাস্তি হবে ছয় মাসের কারাবাস, অথচ রেপ-এর ক্ষেত্রে একটি মহিলা তার চেয়েও কম শারীরিক যন্ত্রণা বোধ করবে, কিন্তু সেখানে শাস্তি হবে যাবজ্জীবন। এটা আনফেয়ার।

শারীরিক যন্ত্রণাটাই দেখবেন, মানসিক যন্ত্রণা দেখবেন না?

না। মন ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটা বস্তু। ঐ বস্তুকে আইনের ভেতরে আনা ঠিক নয়।

আপনার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে।

আচ্ছা, এক মিনিট। এক মিনিটের জন্য আপনি বসুন।

নিশাত বসল। তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে খুব সাবধানে রুমালে সেই পানি মুছল, যাতে দৃশ্যটি সামনে বসা এই নিম্নমানের মানুষটি না দেখে ফেলে। দেখে ফেললে

খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। এই রোগা, কুদর্শন নিম্ন মানসিকতার একটা মানুষ ক্রিমিনাল কেইসের প্রবাদতুল্য পুরুষ, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মন খারাপ হয়ে যায়।

নিশাত আপনার নাম, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আসুন। আই উইল ফাইট ফর হার।

মত বদলালেন কেন?

আমি কেইস নেব না বলায় চোখে পানি এসে গেল, তাই দেখেই মত বদলালাম।

আপনি কেইস নেবেন না এটা শুনে আমার চোখে পানি আসে নি। রেপ সম্পর্কে আপনার ধারণা জেনে চোখে পানি এসেছে।

এটা নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত মতামত। আমি তো এই মতামত প্রচার করছি না। যৌনতা ব্যাপারটাকে অন্য সবাই যেভাবে দেখেছে, সেভাবে আমি দেখছি না। এটা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। আর দশটা শারীরিক ব্যাপারের চেয়ে আলাদা কিছু না। এর সঙ্গে আপনারা মন যুক্ত করে একে মহিমান্বিত করছেন। আমার কাছে তা আনফেয়ার মনে হয়েছে। আজ এটাকে বিরাট অপরাধ মনে করা হচ্ছে। একদিন হয়তো হবে না। মূল্যবোধ বদলায়। এর সঙ্গে-সঙ্গে বদলায় আইন। একসময় শিশুকন্যা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলা হত।

এটাকে কেউ অপরাধ মনে করত না। তারপর অপরাধ মনে করতে শুরু করলাম। এখন আবার করছি না।

এখন করছি না মানে।

ভ্রূণহত্যা করছি। ঢাকা শহরে অসংখ্য ক্লিনিক আছে যারা এম. আর.-এর নামে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। যেহেতু পপুলেশন আমাদের বড় সমস্যা, সেহেতু আমরা দেখেও না-দেখার ভান করছি। কোনো কোনো দেশে ভ্রূণহত্যাকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সব দেশ নিজের সুবিধামতো আইন প্রণয়ন করে। আমেরিকার কথা ধরুন। আমেরিকায় ফোর্জারি বা জালিয়াতির শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অথচ পৃথিবীর অন্য সব দেশে এটাকে চতুর্থ শ্রেণীর অপরাধের পর্যায়ে ফেলা হয়। শাস্তি বড় জোর পাঁচ বছর।

আপনার বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগছে না।

চা খান। চা দিতে বলি। চা খেয়ে আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আসুন। মহিলা কীরকম শক্ত দেখতে চাই। ক্রস একজামিনেশন সহ্য করতে পারবেন কি না কে জানে। কেউ পারে না।

ও পারবে।

না, উনিও পারবেন না। পারার কথা নয়। যাক, সেটা কোনো ব্যাপার না। ট্রায়াল সহ্য করতে না পারাটাই ভালো। জেরার মুখে যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তা হলে বেশ ভালো হয়।

আপনার কথা বুঝলাম না।

ব্যাপারটা সবাইকে এফেক্ট করে। সহানুভূতির অনেকটাই মেয়েটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আসলে কোর্টগুলি চালানো উচিত রোবটদের দিয়ে, যাদের কোনো ইমোশন নেই। পুরোপুরি ন্যায়বিচার মানুষের পক্ষে করা মুশকিল। আচ্ছা, আপনি এখন উঠুন। আমি অন্য কাজ করব।

১৪. পুষ্প হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে

পুষ্প হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। এই ব্যাপারটা কি সত্যি-সত্যি ঘটছে না এটা তার অন্যান্য দুঃস্বপ্নের মতো দুঃস্বপ্ন? মিজান বসার ঘরে বসে আছে। চোখে সানগ্লাস। পরনে। চকলেট রঙের একটা শার্ট। মাথার চুলগুলি ছোট্ট-ছোট্ট করে কাটা। মুখ হাসি-হাসি।

ভাবি চিনতে পারছেন? অধমের নাম মিজান। দরজা খোলা ছিল, বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছি। নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। রকিব বাসায় নেই? ওর সঙ্গে দরকার ছিল।

পুষ্প কী বলবে ভেবে পেল না। তার বুক ধকধক করছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার ঐ দিনকার মতো হবে নাকি? সে প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। সে খুব ঘামতে শুরু করেছে।

আপনি কী চান?

কিছুই চাই না ভাবি। নাথিং। পুলিশ যা যন্ত্রণা করেছে বলার না! কোর্টে হাজির করেই আবার পুলিশ রিমান্ডে। ঐ ইন্সপেক্টার বিরাট হারামজাদা। এখন অবশ্যি ঠাণ্ডা।

পুষ্প মনে-মনে লোকটির সাহসের তারিফ করল। কী সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে যেন কিছুই হয় নি। অনেক দিন পর বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। চা-টা খেয়ে বিদায় নেবে।

রকিবকে খুঁজছিলাম যন্ত্রণা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে। এই জিনিস কোর্টে গেলে তারই অসুবিধা, আমার কিছু না। আমি আজও যেমন ফ্রী ম্যান, দশ দিন পরেও ফ্রী ম্যান।

মিজান সিগারেট ধরাল। সানগ্লাস খুলে রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করে আবার চোখে পরল। হাসিমুখে বলল, ঐ দিন তেমন কিছু হয় নি। ঠাট্টা-তামাশা করেছি। ভয় পেয়ে আপনি হয়ে গেলেন অজ্ঞান। জাস্ট বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলাম। এর বেশি কিছু না। আপনি ভাবলেন কি না কি।

আপনি এখন দয়া করে যান।

যাব তো বটেই। এটা তো ভাবি আমার বাড়িঘর না। তবে এই কথাগুলি রকিবকে বলা দরকার, যাতে তার মনে আবার আমার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা না থাকে। বহুদিনের পুরনো দোস্ত।

আপনাকে যেতে বলছি যান। আমি চিৎকার করে তোক জড়ো করব।

বেশ তো, করুন।

মিজান কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল, যেন সত্যি-সত্যি চিৎকারটার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ভাবি, ঠাণ্ডা মাথায় একটা কথা শুনুন। কোনো বাপের ব্যাটার সাধ্য নেই এই কেইস প্রমাণ করে। কেন তা হলে শুধু-শুধু ঝামেলা করছেন? লজ্জা অপমান যা সবই তো আপনার।

আমার অপমান নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত কেন?

বন্ধুর স্ত্রী, আমি ব্যস্ত হব না? কী বলেন আপনি। অবশ্যি এটা আমার জন্যেও বড় পাবলিসিটি। ব্যবসা করি তো! নানান লোকজনদের সঙ্গে মিশতে হয়। আপনি ভাবি রকিবকে বলবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি এখন মালিবাগের বাসায় আছি। ও ঠিকানা জানে।

মিজান উঠে পড়ল। পুষ্প ছুটে গেল পাশের ফ্ল্যাটে। নিশাত নেই। নিশাতের বোনদুলাভাই আজ চলে যাচ্ছেন। তাঁদের ফ্লাইট রাত দেড়টায়। আজ আর তার দেখা পাওয়া যাবে না। পুষ্প একবার ভাবল বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণপুর চলে যায়। ভয়ে তার গা কাঁপছে। তার কেন জানি মনে হচ্ছে মিজান কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসবে। দরজা বন্ধ থাকলেও কোনোনা-কোনোভাবে ঢুকে পড়বে ভেতরে। হাসি-হাসি গলায় বলবে, ভাবি চিনতে পারছেন? অধমের নাম মিজান।

পুষ্প অবশ্য নিশাতের বাসার ঠিকানা জানে। রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারে। যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আপা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে নতুন ঝামেলা। এমনিতেই আপা যা করছেন, তার নিজের ভাই বা বোন তা করবে না। উকিল সাহেবের ফিসের টাকা পুরোটা উনি দিয়েছেন। অবশ্যি তাকে প্রথম বলেছিলেন, উকিল সাহেব প্রথম দফায় ন হাজার টাকা চেয়েছেন। দিতে পারবে পুষ্প?

পুষ্প বলেছে, আমার কাছে চার হাজার টাকা আছে। আমি ওকে বলব। ও জোগাড় করবে।

রকিব সব শুনে রাগী গলায় বলেছে, প্রথম বারেই নয় হাজার টাকা! এইটা কীরকম উকিল? একজন ব্যারিস্টারও তত পাঁচ শ টাকার বেশি নেয় না। ঐ উকিল বাদ দিতে বল, আমি দেখব।

তুমি চেন কাউকে?

চিনব না কেন? ভালেই চিনি।

পুষ্প নিশাতকে বলল, ও নিজে একজন উকিল দিতে চায় আপা। ওর চেনা কে নাকি আছে। টাকা নেবে না।

নিশাত বলেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। দু-তিন দিন পর জিজ্ঞেস করল, রকিব। সাহেব কি কিছু করেছেন?

না আপা।

জিজ্ঞেস করেছিলে কিছু করেছেন কি না?

জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল করবে। কেইসটার নাকি অনেক দেরি।

খুব দেরি কিন্তু নেই পুষ্প।

ও গা করছে না আপা। শুধু বলছে দেখি। ওর বোধহয় টাকাও নেই। আমার গলার একটা হার দিই আপা, দু ভরি সোনা আছে।

নিশাত বলেছে, আমি পরে তোমার কাছ থেকে হার নিয়ে যাব। এখন আমি চালিয়ে নিই। তুমি চল, তোমার সঙ্গে উকিল সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিই। ওঁকে দেখে প্রথমে ভক্তি হবে না, কিন্তু উনি খুবই নামকরা। উনি যা বলবেন মন দিয়ে শুনবে।

উকিল সাহেব প্রথমে সমস্ত ব্যাপারটা খুটিয়ে-খুটিয়ে শুনলেন। প্রথম মিজান কবে। এ-বাসায় এল, কখন এল, তার পরনে কী ছিল থেকে শুরু। তারপর কত রকম যে। প্রশ্ন। যেমন, মিজান সাহেবের ড্রাইভার কি কখনো বাসায় এসেছিল? মিজান সাহেব কি কখনো চিঠিপত্র লিখেছিলেন?

বেশির ভাগ প্রশ্নেরই পুষ্প জবাব দিতে পারল না। এর মধ্যে একটি হচ্ছেআপনার স্বামী কি কখনো মিজান সাহেবের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে নিয়েছেন। আপনি কিছু জানেন না?

জ্বি-না।

আপনার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবেন।

জ্বি আচ্ছা।

আপনার স্বামীকে বলবেন তিনি যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করেন।

জ্বি আচ্ছা।

তাঁকে কিছু শিখিয়েপড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে। কারণ মিজান সাহেবের উকিল তাঁকে কোর্টে তুলবে। আপনি আগামী পরশু আপনার স্বামীকে আসতে বলবেন। বিকেল পাঁচটায় আমি ফ্রী থাকব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে লিখে রাখছি।

জ্বি আচ্ছা।

আপনাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে। আপনি ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসবার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলবেন না। যা জানেন তাই বলবেন। উকিল আপনাকে প্রশ্ন করলে জবাব নিয়ে আপনি ধাঁধায় পড়ে গেছেন, তখন তাকাবেন আমার দিকে। যদি দেখেন আমি ডান হাত মুঠি করে আছি তা হলে বলবেন, আমার মনে নেই। আর যদি দেখেন আমি দুটি হাতই মুঠি পাকিয়েছি তা হলে বলবেন, এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আমার এসব মনে থাকবে না।

বাজে কথা বলবেন না। অবশ্যই মনে থাকবে।

পুষ্প রকিবকে টাকার কথাটা জিজ্ঞেস করল। রাতে ভাত খেতেখেতে বলল, তোমার বন্ধু কি তোমাকে কোনো টাকা ধার দিয়েছিল?

রকিব চোখ কুঁচকে বলেছে, কেন?

উকিল সাহেব জানতে চাচ্ছিলেন। দিয়েছিল?

এর সাথে মামলার কী সম্পর্ক?

জানি না কি সম্পর্ক। উকিল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন বলেই বললাম। তোমাকে যেতে বলেছেন।

কী মুশকিল, আমি কেন যাব?

যেতে বলেছেন, যাও।

রকিব গেল না। কেন গেল না কে জানে। নিশাত বলল, ঠিক আছে, যেতে না চাইলে কি আর করা। জোর করে তো আর নেওয়া যাবে না। আমি তোমার ল ইয়ারকে বলব। তিনি কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই বের করবেন। উনি বোধহয় চান না তোমার কেইস কোর্টে উঠুক, তাই না পুষ্প?

আমি জানি না আপা। মাঝে-মাঝে মনে হয় চায়। আবার মাঝে-মাঝে মনে হয় চায় না। কী যে মুশকিলে পড়েছি আপা।

কোনো মুশকিল নেই। আমি আছি তোমার পাশে।

নিশাত আপার কথায় পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। যার কথায় ভরসা পাওয়া যেত সে আছে চুপ করে। মিজান আজ এসেছিল এই খবর শুনলে সে কী করবে কে জানে। হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে যাবে। তাকে এই খবর কিছুতেই বলা যাবে না। বরং একতলার বাড়িওয়ালার বাসা থেকে নিশাত আপাকে টেলিফোন করে বলা যায়।

পুষ্প তাই করল।

১৫. দুপুরের খাবারের বিশাল এক আয়োজন

সুরমা দুপুরের খাবারের বিশাল এক আয়োজন করেছেন। ঢাকার সব আত্মীয়স্বজনদের বলেছেন। মেয়ে-জামাই চলে যাবে এই উপলক্ষে সবাই মিলে একটা উৎসব।

আনন্দ-উৎসবের সুর এখানে বাজছে না, মীরু অনবরত কাঁদছে। দেশ থেকে যাবার দিন মীরু সবসময় এরকম করে কেঁদে-কেঁদে ভাসায়। তার কান্নাকাটি দেখে নিমন্ত্রিত অথিতিরাও অস্বস্তি বোধ করেন। সুস্বাদু সব খাবারও মুখে রোচে না।

ইয়াকুব স্ত্রীকে কিছুক্ষণ সামলাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। সে এখন বসেছে। জহিরের পাশে। বারান্দার এক কোণায়। সাউথ ডেকোটার পেট্রোয়াড ফরেস্টের গল্প এমন ভঙ্গিতে করছে যে জহির মুগ্ধ। শুরুতে জহিরের মনে হয়েছিল মানুষটা অহঙ্কারী। সেই ভুল তার দ্বিতীয় দিনেই ভেঙেছে। মানুষটা মোটেই অহঙ্কারী নয়। দারুণ আমুদে এবং খুবই খরচে স্বভাবের। দু হাতে টাকা খরচ করে। মুখ শুকনো করে বলে, সাত দিনের জন্যে দেশে বেড়াতে এসে দেখি পথের ফকির হলাম রে ভাই! বলেই পর মুহূর্তে আরো বড় সংখ্যার টাকা খরচ করে বসে।

খুব খরচে স্বভাবের মানুষও আমেরিকায় দীর্ঘ দিন থাকলে ধাতস্থ হয়ে যায়। খরচে স্বভাব নিয়মের ভেতর চলে আসে। এই লোকটির তা হয় নি। তার খরচে স্বভাবের একটা নমুনা কিছুক্ষণ আগে জহির দেখল এবং তার চমৎকার লাগল। ব্যাপারটা এই রকম

ইয়াকুব দেশে খরচ করবার জন্যে যা ডলার জমিয়েছিল তার পুরোটা সে খরচ করতে পারে নি। দু হাজার সাত শ টাকা বেঁচে গিয়েছে। এই টাকাটা সে ফেরত নিতে চায় না।

টাকাটা খরচ করবার একটা কায়দাও সে বের করল। একটা লটারি হবে। এবাড়ির মানুষদের মধ্যে লটারি। যার নাম উঠবে সেই পুরো টাকাটা পাবে। সবার খুব উৎসাহ নাম লিখে একটা ঠোঙায় রাখা হল। ইয়াকুব বলল, এ-বাড়ির কাজের লোকদের নাম দেওয়া হয়েছে তো? সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, সে-কী! ওদের নাম কেন? ইয়াকুব হেসে বলল, ওরাও তত এ-বাড়িরই লোক মা। ওরা বাদ থাকবে কেন? ভাগ্যক্রমে ওরা যদি কেউ পায় তো কেমন মজা হয় দেখবেন। ওদের আনন্দটা দেখবার মতো।

হলও তাই। মালীর নাম উঠে গেল।

সে কিছুক্ষণ ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না। টাকা হাতে নিয়ে বোকার মতো সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ইয়াকুব বলল, যাও, এবার টাকা খরচ কর। লটারিতে জিতলে। তোমার নাম উঠেছে।

মালী তবুও নড়ে না। ভয়ে-ভয়ে অন্যদের মুখের দিকে তাকায়। শেষটায়। কেঁদেকেটে বিরাট এক নাটক।

এই নাটকটি জহিরের পছন্দ হয়েছে। সে মুগ্ধ। এখনো সে পেট্রোয়াড ফরেষ্টের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনছে। ইয়াকুব গল্প বলছে সমস্ত শরীর দিয়ে, হাত নাড়ছে, ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে।

পুরো বনটাই অনেক অনেক বছর আগে কোনট-এক প্রাকৃতিক কারণে পাথর হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার। বনের কীটপতঙ্গ সবই পাথর। চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না।

আপনি নিজে দেখেছেন দুলাভাই?

আফকোর্স। পাঁচ ডলার করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। তবে ঢেকবার পর মনে হয় টিকেটের দাম আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। লোকজন আমেরিকা যায়। দেখে ফালত জিনিস। সিয়ার্স টাওয়ার, ডিজনিল্যান্ড। মানুষের তৈরি জিনিস তো সব জায়গায় এক রকম। প্রকৃতি একেক জায়গায় একেক রকম কাজ করে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কথা তোমাকে বলি। এক মিনিট, সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আসি।

ইয়াবুক উঠে চলে গেল। ঠিক তখন নিশাত এসে বলল, তুমি কি আমাকে একটু থানায় নিয়ে যাবে?

জহির ঠাণ্ডা গলায় বলল, কেন?

পুষ্প টেলিফোন করেছিল। মিজান সম্ভবত জামিনে ছাড়া পেয়েছে। কত বড় সাহস, দেখা করতে এসেছে পুষ্পের সঙ্গে।

তার জন্যে তুমি থানায় গিয়ে কি করবে?

জানব ব্যাপারটা কী। নন-বেইলেবল ওয়ারেন্টে যে গ্রেফতার হয় সে ছাড়া পায় কীভাবে, সেটা জিজ্ঞাসা করব। থানায় টেলিফোন করেছিলাম, শুধু এনগেজ পাচ্ছি।

জহির শান্ত গলায় বলল, আমি এখন তোমাকে নিয়ে কোথাও যাব না। তোমার যদি যেতেই হয় নিজে নিজে যাও। এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করছ, আমি কিছু বলি

নি। এই মুহূর্তে এটা নিয়ে আর ছোটাছুটি না করলে খুশি হব। এক দিন সোশ্যাল ওয়ার্ক না করলে তোমার তেমন কোনো ক্ষতি হবে না এবং তোমার বান্ধবীরও কোন বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। যা হবার ইতোমধ্যে হয়েছে।

নিশাত বলল, প্লীজ, তুমি আমার সঙ্গে এই সুরে কথা বলো না। আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমি খুব সহজভাবেই তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি দয়া করে এখানে বসে অন্তত এক দিনের জন্যে মাথাটা হালকা রাখ। তুমি প্রতিটি মানুষকে বিরক্ত করছ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তাই। তোমার মীরু আপা বলছিলেন, ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে তোমার মাথাটা দেখাতে। তোমার মাথায় নাকি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

বোধহয় হয়েছে।

নিশাত, বস আমার পাশে। বী ঈজি। এস দুলাভাইয়ের গল্প শুনি।

ইয়াকুব সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছে। নিশাতকে দেখে হাসিমুখে বলল, বিখ্যাত সমাজ-সেবিকা এইখানে কেন?

সমাজ-সেবা আজকের দিনের জন্যে স্থগিত। আজ শুধু আপনাদের সেবা করব।

চমৎকার, খাবার দেওয়ার এখনো সম্ভবত ঘন্টাখানেক দেরি আছে। তুমি আমাদের জন্যে ঠাণ্ডা কিছু নিয়ে এস এবং ক্যামেরাটা এনে আমাদের দু জনের প্রাণখুলে, গল্প করার ছবিটা ধরে রাখা

আমি গল্প শোনবার জন্যে বসলাম দুলাভাই। আমি নড়াচড়া করতে পারব না।

ইয়াকুব গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গল্প শুরু করল। জহির লক্ষ করল নিশাত সেই গল্প। শুনছে না। সে খুবই অন্যমনস্ক। সে অন্য কিছু ভাবছে।

১৬. টেলিফোন

স্পেশাল ব্রাঞ্চের এ. আই. জি. আবদুল লতিফ, নুরুদ্দিনকে টেলিফোন করেছেন। নুরুদ্দিন প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে দুবার করে স্যার বলছেন। তার চেয়ারে বসে থাকার মধ্যেও একটা অ্যাটেনশন ভঙ্গি চলে এসেছে। কথা ভালো শোনা যাচ্ছে না। লাইন ভালো না। থানায় হৈচৈও হচ্ছে প্রচুর। লোজন কোথেকে এক পাগল ধরে এনেছে, সে বড় ঝামেলা করছে। নুরুদ্দিন চোখে ইশারা করছেন, পাগল সরিয়ে নিতে। তাঁর চোখের ইশারা কেউ বুঝতে পারছে না।

এ. আই. জি. আবদুল লতিফ সাহেব বললেন, কথা শুনতে পাচ্ছেন, লাইনটা ডিস্টার্ব করছে।

জ্বি স্যার, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি স্যার।

জামিন হয়েছে আপনি জানেন তো?

জ্বি স্যার জানি।

ইনোসেন্ট লোকদের হ্যারাসমেন্ট যাতে কম হয় সেটা দেখতে হবে তো। পুলিশের তাই দায়িত্ব।

তা তো বটেই স্যার।

সোসাইটির রেসপেক্টেবল মানুষদের হাতে চোরগুণ্ডাদের সঙ্গে ফেলে রাখার কোন যুক্তি আছে কি? এরা তো পালিয়ে যাবার লোক না। কোর্ট যখন চাইবে তখনই এরা কোর্টে হাজির হবে।

তা তো ঠিকই স্যার।

এটা খেয়াল রাখবেন।

নিশ্চয়ই স্যার। তবে.....

আবার তবে কী?

না স্যার, বলছিলাম কি, যদি ভিকটিমকে বিরক্ত করে বা ভয় দেখায় তা হলে.....।

সেরকম কিছু দেখিয়েছে?

এখনো কোনো খবর পাই নি স্যার।

তা হলে মনগড়া কথা বলছেন কেন? অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাবেন না। অতিরিক্ত উৎসাহ ভালো না।

তা তো স্যার ঠিকই।

নুরুদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর এখন তেমন কিছু করার নেই। মিজান ঘুরে বেড়াবে, কেউ তাকে কিছু বলবে না। মামলা কোর্টে না ওঠা পর্যন্ত তার আপাতত কোন সমস্যা নেই। নন-বেইলেবল সেকশনের আসামী সমাজের উচু একটা স্তরে আছে বলেই বুকে ফু দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা সহ্য করা বেশ কঠিন। সহ্য করতে হয়। এর নাম চাকরি।

স্যার আপনার টেলিফোন।

আবার কে?

সেকেন্ড অফিসার ইঙ্গিতপূর্ণ একটি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল।

অফিসার ইনচার্জ বলছি।

কে, নুরুদ্দিন? চিনতে পারছ?

জ্বি স্যার। স্লামালিকুম স্যার।

একটা রেপ কেসের ইনভেস্টিগেশন তোমার এখানে হচ্ছে না?

জ্বি স্যার।

কত দূর।

দু-একদিনের মধ্যে ইনভেস্টিগেশন শেষ হবে স্যার।

গুড, ভেরি গুড। এইসব কেসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

তা তো স্যার ঠিকই।

অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার। কঠিন শাস্তি।

অবশ্যই স্যার।

সেইসঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে নিরপরাধ যাতে শাস্তি না পায়।

অবশ্যই স্যার।

মিজানকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি। চমৎকার ছেলে। সে কীভাবে জড়িয়ে পড়ল বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ভিকটিম অব সারকমটেন্স। যাই হোক, তুমি তোমার তদন্ত কর। মিজানের ব্যাপারে কোন রেফারেন্সের দরকার হলে আমাকে বলবে।

নিশ্চয়ই বলব স্যার। অবশ্যই বলব।

আচ্ছা রাখলাম।

স্লামালিকম স্যার।

নুরুদ্দিন দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইল। পাগলটা এখনো যন্ত্রণা করছে। থানার সবাই মনে হচ্ছে তাতে মজা পাচ্ছে। সবাই হাসছে। সেকেন্ড অফিসার নুরুদ্দিনকে বলল, স্যার দেখুন, পাগলটা আপনাকে ভেংচি কাটছে।

নুরুদ্দিন দেখলেন, পাগলটা সত্যি-সত্যি জিভ বের করে তাঁকে দেখাচ্ছে।

১৭. দুটি গোলাপগাছ মরে গেছে

দুটি গোলাপগাছ মরে গেছে। জহির অবাক হয়ে গাছ দুটিকে দেখছে। যে-কদিন বেঁচে ছিল এরা প্রচুর ফুল ফুটিয়েছে। বিরাট বড়-বড় ফুল। হাতের মুঠোয় ধরা যায় না এত বড়। নামও অদ্ভুততাজমহল। গোলাপের তাজমহল নাম কে রেখেছিল কে জানে। যেই রাখুক এ-বাড়িতে তাজমহলের সমাধি হয়ে গেল। জহির রান্নাঘরে ঢুকল। নিশাত পানি গরম করছে। তার চোখ লাল। মনে হচ্ছে কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি। সে জহিরের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে হাসল। জহির বলল, দুটি তাজমহল মরে গেছে। তুমি সেটা জান?

জানি।

মনে হচ্ছে খুব একটা দুঃখিত হও নি।

হয়েছি, তবে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসি নি। চা খাবে?

না। আমি বেশ শক হয়েছি।

হওয়াই উচিত। তাজমহলের মৃত্যুতে শাহজাহানরাই শকড় হবে। তুমি হচ্ছ শাহজাহান।

তার মানে?

ঠাট্টা করছি।

ঠাট্টা করছ, খুবই ভালো কথা, তবে তোমার উচিত সংসারটার দিকে আরো একটু নজর রাখা।

সংসারটা তো আমাদের দু জনের, তাই না? আমার একার তো নয়। আমিও তোমাকে খুব কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করতে পারি না, গাছ দুটি কেন মরল?

জহির অবাক হয়ে বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাচ্ছ?

মোটই না। তুমি আমার প্রিয়তম মানুষ, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব কেন?

আমার মনে হয় কিছু একটা হয়েছে, সেটা কী?

আমার ঘুম হচ্ছে না। সারা রাত প্রায় জেগে কাটাই। আমাকে কিছু ঘুমের ওষুধ এনে দেবে?

ঘুম হচ্ছে না কেন?

সোমবার কেইস কোর্টে উঠছে, সেই দুঃশ্চিন্তাতেই বোধহয়।

তোমার কিসের দুঃশ্চিন্তা?

সেটাও তো বুঝতে পারছি না। গত দু রাত আমি এক সেকেণ্ডের জন্যেও চোখের পাতা ফেলতে পারি না। কেইস শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমি বোধহয় ঘুমুতে পারব না।

জহির অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নিশাত বলল, তুমি কি আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কোর্টে আমার পাশে বসে থাকবে?

তোমার কোর্টে যাবার কি আর দরকার আছে? যা করবার সবই তো করেছ।

নিশাত ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাক, তোমাকে যেতে হবে না। অন্যায় একটা অনুরোধ করলাম, কিছু মনে করো না।

পুষ্পকে কাঠগড়ায় ডাকা হয়েছে। শপথ নেওয়ানো হবে। মিজানের পক্ষের উকিল ক্রস একজামিনেশন শুরু করবে। আদালতে চাঞ্চল্য লক্ষ করা যাচ্ছে। এ-জাতীয় কেইসের ক্রস একজামিনেশন সাধারণত খুব মজার হয়ে থাকে। পুষ্পের ভেতরে একটা দিশাহারা ভাব দেখা যাচ্ছে। সে বারবার নিশাতের দিকে তাকাচ্ছে। জহির বসে আছে নিশাতের পাশে। সে সাত দিনের ছুটি নিয়েছে। বিচার চলাকালীন সময় সে তার স্ত্রীর সঙ্গেই থাকবে। নিশাতের শরীর অসম্ভব খারাপ করেছে। মনে হচ্ছে চোখ বন্ধ করে এক্ষুণি সে এলিয়ে পড়বে। জহির ফিসফিস করে বলল, খুব খারাপ লাগছে?

নিশাত বলল, না। শুধু পানির পিপাসা হচ্ছে।

চল, পানি খেয়ে আসা যাক।

না, আমি যাব না।

মাথার উপরে একটা ফ্যান আছে। কিছুক্ষণ পরপর ঘটাং-ঘটাং শব্দ হচ্ছে। কোর্টঘরে নতুন চুনকাম করা হয়েছে। চুনের গন্ধের সঙ্গে মানুষের ঘামের গন্ধ মিশে কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে। সরদার একরিম চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁকেও কেন জানি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। আসামী পক্ষের উকিল হচ্ছেন মিশ্রবাবু। অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক। তিনি কীভাবে ডিফেন্স নেবেন তা আঁচ করা বেশ কঠিন। ক্রস একজামিনেশন তিনি বেশ সহজভাবেই শুরু করেন। কিন্তু সেই সহজ জিনিস অতি দ্রুত কঠিন হতে শুরু করে। সাক্ষী বুঝতেও পারে না তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে চোরাবালিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যতই সে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করবে, ততই তাকে ডুবে যেতে হবে।

বলুন, আমি শপথ করিতেছি যে, যাহা বলিব সত্য বলিব.....

পুষ্প যন্ত্রের মতো শপথবাক্য উচ্চারণ করল।

তারপরই তার বক্তব্য তাকে বলতে বলা হল। পুষ্প বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল। তার মুখ রক্তশূন্য এবং বারবার সে নিশাতের দিকে তাকাচ্ছিল। এ ছাড়া চোখে পড়ার মতো কিছু তার আচরণে ছিল না। দু বার তার কথার মাঝখানে কোর্টে বড় রকমের গুঞ্জন উঠল। জজসাহেবকে হাতুড়ি পিটিয়ে বলতে হল–অর্ডার অর্ডার।

তার পাশের কাঠগড়াতেই মিজান দাঁড়িয়ে আছে। সে এক বার মিজানের দিকেও তাকাল। মিজান তাকে কৌতূহলী চোখে দেখছে।

মিশ্রবাবু এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ হাসি-হাসি। তিনি পুষ্পের দিকে তাকিয়েও অল্প হাসলেন।

আপনার নাম? পুষ্প।

এটা তো আপনার ডাকনাম, ভালোনাম বলুন। নাকি আপনি চান আমরা সবাই আপনাকে ডাকনামে চিনি।

আদালতে ছোট একটা হাসির গুঞ্জন উঠল। পুষ্প বলল, আমার ভালোনাম রোকেয়া।

আপনার স্বামীর নাম হচ্ছে রকিব আহমেদ, তাই না?

জ্বি।

সাধারণত স্বামীর পদবী মেয়েরা ব্যবহার করে থাকেন, যেমন আপনার নাম হত রোকেয়া আহমেদ। আপনি তা করছেন না, বাবার নামটাই আপনার বহাল আছে—এর কারণ কি?

পুষ্প জবাব দিল না। মিশ্রবাবু জবাবের জন্যে তেমন অপেক্ষাও করলেন না। দ্রুত অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন।

আপনি স্বামীর নাম ব্যবহার করতে চান না, তার কারণ সম্ভবত স্বামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো নয়।

সম্পর্ক ভালো।

আপনার স্বামী কি কোর্টে উপস্থিত আছেন?

জ্বি-না।

স্ত্রীর এত বড় একটি কেইসের ট্রায়াল চলছে, অথচ স্বামী উপস্থিত নেই এটা কি ভালো সম্পর্কের কোনো উদাহরণ?

কোর্টে বড় রকমের হাসির শব্দ উঠল। পুষ্প অসহায়ভাবে তাকাল নিশাতের দিকে। তার পরই সহজ গলায় বলল, আমাদের একটা খুব ছোট বাচ্চা আছে। আমার স্বামী তার দেখাশোনা করছেন। বাচ্চাটার আজ জ্বর। এক শ দুই জ্বর।

আপনি কি আসামীকে চেনেন?

জ্বি। আমার স্বামীর বন্ধু।

কী রকম বন্ধু। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু কি?

জ্বি।

আপনার স্বামী দুবার আসামীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়েছেন, এটা কি আপনি জানেন?

জ্বি-না।

করিম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি অবজেকশন দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু না-দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন অর্থসাহায্য যে করা হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই।

করিম সাহেব তা বললেন না। কারণ মিশ্রবাবু অতি ধুরন্ধর লোক, বিনা প্রমাণে এই প্রসঙ্গ কোর্টে তুলবেন না।

অর্থসাহায্য ছাড়াও আপনারা বিভিন্ন সময়ে আসামীর কাছ থেকে নানান সাহায্য নিয়েছেন। আসামী আপনাদের জন্যে বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন, তাই না?

জি।

আপনাদের ভ্রমণের জন্যে তিনি গাড়ি এবং ড্রাইভার দিতেন।

এক দিন দিয়েছিলেন।

এখন বলুন, আসামী মিজান মাঝে-মাঝে দুপুরবেলায় আপনাদের বাসায় যেতেন, একটু আগেই এ-কথা বলেছেন আপনি। তাই না?

জ্বি। স্বা

মীর অনুপস্থিতিতে যে উনি আপনার বাসায় আসতেন, আপনার স্বামী কি তা জানতেন?

জ্বি, জানতেন।

তিনি এটাকে বিশেষ কিছু মনে করেন নি, তাই না?

জ্বি।

তিনি ইচ্ছে করে আপনাদের এই মেলামেশায় সুযোগ দিচ্ছিলেন।

জ্বি-না।

আপনার একটি ছোট্ট ছেলে আছে পল্টু তার নাম, তাই না?

জ্বি।

ঘটনার দিন পল্টু কোথায় ছিল?

নিশাত আপার বাসায়।

আমি যদি বলি আপনি স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে যৌন-মিলনের সুবিধার কারণে আপনার ছেলেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তা হলে আপনি কি বলবেন?

পুষ্প হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মিশ্রবাবু বিজয়ীর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাঁর এই দীর্ঘ জেরার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মেয়েটিকে কাঁদিয়ে দেওয়া। নিশাত বিড়বিড় করে বলল, লোকটা এসব কী বলছে? এত নোংরা কথা সে কী করে বলছে? জহির তার দিকে তাকিয়ে বলল, আরো হয়তো কত কী বলবে! মনে হচ্ছে এটা মাত্র শুরু। তবলার ঠুকঠাক।

পুষ্পর কান্না তখন পুরোপুরি থামে নি। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে উঠছে। এর মধ্যেই আবেগশূন্য গলায় মিশ্রবাবু তাঁর ডিফেন্স পেশ করলেন, এই মামলায় দীর্ঘ ক্রস একজামিনেশন বা

প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো প্রয়োজন দেখছি না। ডাক্তারের দেওয়া মেডিকেল রিপোর্টই যথেষ্ট মনে করি। সেখানে বলা হয়েছে কোনন সিমেন পাওয়া যায় নি। ধর্ষণের সময় ভিকটিম সাধারণত প্রবল বাধা দেয়, সে-কারণে তার শরীরে নানান ক্ষত থাকে, তাও নেই। মামলা ডিসমিসের জন্যে এই যথেষ্ট। তবুও ঘটনাটা কী আমি বলছি। বিশ্বাস না-করলেও মামলার ক্ষতি হবে না। তবে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য, তা আপনারা সবাই স্বীকার করবেন।

এই সমাজে কিছু-কিছু লোক তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের ব্যবহার করে কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধার জন্যে। রকিব সেই রকম একজন মানুষ। সে ক্রমাগত তার ধনী বন্ধুর কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে এবং ইন রিটার্ন এগিয়ে দিচ্ছে সুন্দরী স্ত্রীকে। স্ত্রীও স্বামীর কথামতোই কাজ করছেন। মিলনের ক্ষেত্র তৈরি করবার জন্যে পুত্রকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ যে পুত্রের সামনে বৃন্দাবন লীলা না দেখানোর মতো সুবুদ্ধি তাঁর হয়েছে।

কোর্ট সেদিনকার মতো অ্যাডজর্নড হয়ে গেল। নিশাত চোখে অন্ধকার দেখল। এ তো ভরাডুবি! সরদার এ করিম কোর্ট অ্যাডজর্নড হবার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কী হবে এ নিয়ে সে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারল না। পুষ্প ক্রমাগত কাঁদছে। তাকে সামলাননও এক মুশকিল। লোকজনের কৌতূহলেরও কোন সীমা নেই। এক ফটোগ্রাফার বিশেষ অ্যাংগেল থেকে পুষ্পর কান্নার ছবি তোলবার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসাও মুশকিল। নিশাতের নিজেরও কান্না পেয়ে গেল।

১৮. আসামীর ক্রস একজামামিনেশন

আজ আসামীর ক্রস একজামামিনেশন হবে।

আসামী কাঠগড়ায় উপস্থিত।

সরদার এ. করিম এগিয়ে গেলেন।

আপনার নাম মিজানুর রহমান?

জ্বি।

পুষ্প নামের মেয়েটিকে আপনি চেনেন?

জ্বি চিনি।

সে যে অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে করেছে সেই সম্পর্কে আপনি কী বলতে চান?

অভিযোগ সত্যি নয়।

আমার জেরা শেষ হয়েছে। আপনি নেমে যেতে পারেন। এখন আমি আমার বক্তব্য পেশ করব।

মিজান অবাক হয়ে তাকাল। জজসাহেব তাকালেন। কোর্টে মৃদু একটা গুঞ্জন হল। করিম সাহেব সুবার বিস্ময় উপভোগ করলেন। নিশাতের দিকে তাকিয়ে হাসির মতো ভঙ্গি করলেন। ইচ্ছে করেই এই নাটকীয়তা তিনি করছেন। এতে সবার মনোযোগ খুবই তীব্রভাবে তিনি আকর্ষণ করতে পারলেন। এর প্রয়োজন ছিল।

মাননীয় আদালত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমি এখানে একটি দুর্বল মামলা পরিচালনা করতে এসেছি। আমার মক্কেলের মেডিকেল রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায় নি। কোন প্রত্যক্ষদশীর সাক্ষ্য আমরা জোগাড় করতে পারি নি।

আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, এ-দেশের ধর্ষিতা মেয়েদের মেডিকেল রিপোর্টে কখনো কিছু পাওয়া যায় না। ধর্ষিতা মেয়েরা প্রথমে যে কাজটি করেন তা হচ্ছে ধর্ষণের সমস্ত চিহ্ন শরীর থেকে মুছে ফেলেন। অনেক বার করে স্নান করেন। গায়ে সাবান ঘষেন। কারণ তাঁদের ধারণা নেই যে, এটা করা যাবে না। এটা করলে আসামীকে আমরা আইনের জালে আটকাতে পারব না।

আসামীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আরেকটি বড় বাধা সামাজিক বাধা। এই লজ্জা এবং অপমানের বোঝ কোনো মেয়ে সাহস করে নিতে চায় না। যখন কেউ সাহস করে, তখন কোর্ট তাকে মোটামুটিভাবে ব্যাভিচারিণী হিসেবে প্রমাণ করে দেয়। আমার মক্কেলের ব্যাপারেও সেটা ঘটেছে। তবে আমার মক্কেল শেষ পর্যন্ত কোনে মামলা নিয়ে আসতে পেরেছে, এটা তার জন্যে একটা বড় বিজয়। অনেকেই তা পারে না। তাদের মামলা তুলে নিতে হয়। যেমন মামলা তুলে নিতে হয়েছিল ২১-বাই-বি ঝিকাতলার আশরাফী খানমকে।

আশরাফী খানম আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ৫ই এপ্রিল ১৯৭৬ তারিখে মোহাম্মদপুর থানায় ডাইরি করিয়েছিলেন। সেই ডাইরিতে উল্লেখ আছে যে জনৈক মিজানুর রহমান তাঁকে ধর্ষণ করে। যথারীতি পুলিশ তদন্ত হয়। তবে তদন্তের মাঝামাঝি ফরিয়াদী পক্ষ কেইস উঠিয়ে নেয়। হয়তোবা আমি বলতে পারি কেইস উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যদি সেদিন সে তা উঠিয়ে না নিত তা হলে আজ এই মেয়েটি ধর্ষিতা হত না।

মাননীয় আদালতের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি আমরা কি তৃতীয় একটি মেয়েকে ধর্ষিতা হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখব নাকি রাখব না।

আমার বক্তব্য এই পর্যন্তই। আশরাফী খানম মোহাম্মদপুর থানায় যে-জবানবন্দি দিয়েছিলেন তার কপি আমি আদালতে পেশ করেছি।

করিম সাহেব বসে পড়লেন। দীর্ঘ সময় আদালতে কোন সাড়াশব্দ হল না। এ. করিম সাহেব নিশাতের কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, আমার তো ধারণা আমরা কেইস জিতে গেছি। আপনার কি তাই মনে হচ্ছে না?

১৯. নিশাত খুব কাঁদছে

নিশাত খুব কাঁদছে। জহির অবাক হয়ে বলল, তুমি এত কাঁদছ কেন? মামলা তো জিতে গেলে একটা লোককে সারা জীবনের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দিলে। আজ তো তোমার আনন্দ করার দিন। ব্যাপারটা কি বল তো?

ব্যাপারটা নিশাত বলতে পারল না। কারণ তা বলার মতো নয়। একই ঘটনা তার জীবনেও ঘটেছিল। সে তখন মাত্র কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। বড় দুলাভাই এক দুপুরবেলা তার ঘরে ঢুকে পড়লেন। কী লজ্জা, কী অপমান, কাকে সে বলবে? মীরু আপাকে? মাকে? বাবাকে? কাউকেই সে বলে নি। বলতে পারে নি। আজো পারবে না।

তবে আজ সে মুক্তি পেয়েছে। মনের একটা বিরাট দরজা এত দিন বন্ধ ছিল। আজ খুলে গেছে। এক ঝলক সূর্যের আলো ঢুকে গেছে। আজ সে কাঁদছে আলোর স্পর্শে।*